প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশক
নারায়ণ সেনগুপ্ত
৭/১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
গণেশ বসু

দাম চার টাকা

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল একটি দ্যুতিমান ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বকে নানা দিক থেকে দেখার ফল এই গ্রন্থ। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, 'অনেকবার ভেবেছি তিনি যদি বঙ্গ-সাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত।' বীরবলের চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বর্তমান গ্রন্থরচনায় প্রেরণা জুগিয়েছে।

এবার ঋণস্বীকারের পালা। বর্তমান গ্রন্থরচনায় বন্ধুবর ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র ও অগ্রজপ্রতিম কথাশিল্পী শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় বহুদিন ধরে প্ররোচনা দিয়েছেন। তরুণ কথাশিল্পী শ্রীপ্রফুল্ল রায় প্রকাশনা ব্যাপারে সহায়তা করেছেন। আমার পত্নী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায় ও অনুজ শ্রীমান অজয়কুমার প্রুফ দেখায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। প্রকাশক শ্রীনারায়ণ সেনগুপ্তের আগ্রহে একমাসের মধ্যে মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হল। এঁদের কাছে আমি ঋণী রইলাম।

এই গ্রন্থপাঠে যদি বীরবল সম্পর্কে পাঠকসমাজের আগ্রহ বাড়ে, তবে শ্রম সার্থকজ্ঞান করব।

৭ই জুন, ১৯৬০

প্রেসিডেন্সি কলেজ,

কলিকাতা-১২

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

এই লেখকের—

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

(ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে)

রবীন্দ্র-মনীষা (অচির প্রকাশিতব্য)

শ্রীবিনয়কুমার ভট্টাচার্য
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

অভিন্নহৃদয়যুগলেষু

সূচী—

সত্যকথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি
দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল,
কথায় কথায় যাহে ভরে আসে জল,—
আমি খুঁজি চোখে চোখে আনন্দের হাসি॥
তাই আমি নাহি করি দুঃখেতে মমতা,
সুখী যারা, তারা মোর মনের মানুষ।
হাসিতে ছড়ায় তারা নিষ্ঠুর ক্ষমতা,
মনে জেনে বিশ্ব শুধু রঙীন ফানুস॥

—বীরবল

শাহান্‌শা আকবর দিল্লীতে রাজসভায় পাত্রমিত্র নিয়ে বসে আছেন। নানা রহস্যালাপ চলছে। হঠাৎ আকবর প্রশ্ন করলেন, বীরবল, দিল্লীতে কতগুলি কাক আছে? বীরবল কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, বাদশা, এই শহরে ৯৯,৯৯৯টি কাক আছে। আপনি গুনে দেখলেই আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন। যদি দেখেন কাক এই সংখ্যার চেয়ে কিছু বেশী, তাহলে জানবেন, দিল্লীর উপকণ্ঠ থেকে রাজধানীর কাকদের স্বজন-বান্ধবরা দেখা করতে এসেছে। আর যদি দেখেন, এই সংখ্যার কিছু কম সংখ্যক কাক দিল্লীতে আছে, তাহলে জানবেন তারা দিল্লীর বাইরে তাদের আত্মীয়-বন্ধু কাকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও শিষ্টাচার দেখাতে গিয়েছে। এই জবাব পেয়ে শাহান্‌ শা নিরুত্তর; তাঁর মুখ বন্ধ হল।

(মুখবন্ধ স্বরূপ রাজা বারবল সম্পর্কে যে গল্পটি উদ্ধার করেছি সে ধরণের বহু গল্প তাঁর নামে আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। এর মধ্যে বীরবলের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, পরিহাসনৈপুণ্য, কাণ্ডজ্ঞান ও যুক্তিপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই গুণগুলির চর্চা বাংলা সাহিত্যে যিনি করেছিলেন, তিনিই 'বীরবল' ওরফে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)।)

পাবনার বিখ্যাত চৌধুরী বংশের সন্তান প্রমথ চৌধুরী কেবল বংশ-অর্থ-কৌলিন্যে অভিজাত বংশের ছিলেন না, মনের ক্ষেত্রেও তিনি অভিজাত ছিলেন। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে পাবনায়, কৈশোর কৃষ্ণনগরে, যৌবন বিলেত ও কলকাতায়, বার্ধক্য কলকাতায়। তিনি আসলে পূর্ব বা পশ্চিম কোনো বঙ্গেরই লোক ছিলেন না, তিনি বিদ্যানগরের বিদগ্ধ নাগরিক। রাণী ভিক্টোরিয়া-বংশ-শাসিত ভারত সাম্রাজ্যের প্রজা নন, কালিদাসের উজ্জয়িনী ও পেরিকল্‌স্‌-এর আথেন্স নগরের তিনি বাসিন্দা। এ-কাল সে-কালের জ্ঞানের রাজ্যে তাঁর অবাধ ভ্রমণের ছাড়পত্র ছিল। তিনি রাজলেখক। অনুশীলিত দেহের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহাকবি কালিদাস বলেছেন, সে দেহ মেদচ্ছেদকৃশোদর,

'প্রগুণ, প্রাণসার, উৎসাহযোগ্য; সে দেহ ভার বর্জন করেছে, সার অর্জন করেছে, তা অদম্য প্রাণশক্তির আধার; সে দেহ পলিমাটি-লতাপাতা-খাওয়া হোঁৎকা হাতীর দেহের মত নয়, তা গিরিচর নাগের দেহের মত। এই বর্ণনা অনুশীলিত মনের যথার্থ পরিচয়। প্রমথ চৌধুরী এই অনুশীলিত মনের অধিকারী ছিলেন।

॥ ২ ॥

'বীরবল' ছদ্মনামটি কেন গ্রহণ করেছেন, তার উত্তর দিতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন: 'আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না ভেবেচিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম'। ('বীরবল' প্রবন্ধ)। এ নাম তিনি ভেবেচিন্তেই অবলম্বন করেছিলেন, তা উক্ত প্রবন্ধ পড়লেই বোঝা যায়। বীরবল-চরিত্রের দুটি গুণ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল—বীরবলের অনন্যসাধারণ প্রখর পরিহাসপ্রবণতা এবং যুক্তিধর্মিতা। বীরবল উইট ও রীজন-এর ভক্ত ছিলেন এবং শাহান্ শা আকবরকে সে ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। ইমোশন-এর চর্চা প্রমথ চৌধুরী করেন নি, তিনি র‍্যাশনালিজম্-এর চর্চা করেছেন। স্যানিটি (কাণ্ডজ্ঞান), ক্ল্যারিটি (প্রসাদগুণ) ও রিজ্‌ন (যুক্তি) আশ্রয় করলে জীবনে অনেক দুঃখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, এ কথা প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করতেন। বিখ্যাত ফরাসি লেখক আঁদ্রে মোরোয়া বলেছেন, 'The most civilised way of being sad is to be humorous'। প্রমথ চৌধুরী এ কথা সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

তিনি বলেছেন, "আমি বাঙ্গালী জাতির বিদূষক মাত্র। তবে রসিকতাচ্ছলে সত্য কথা বলতে গিয়ে ভুল করেছি। কারণ নিত্য আমি দেখতে পাই যে, অনেকে আমার সত্য কথাকে রসিকতা বলে, আর আমার রসিকতাকে সত্য কথা বলে ভুল করেন। এখন এ ভুল শোধরাবার আর উপায় নেই। পাঠকেরা যে আমার লেখার ভিতর সত্য না পান, রস পেয়েছেন, এতেই আমি কৃতার্থ।" (বীরবল প্রবন্ধ)। এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গদিগ্ধ মন্তব্যের আলোয় প্রমথ চৌধুরীর মনের চেহারাটা

আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালি জীবনে ইমোশন্‌-এর অতিচর্চার ফল মননশীলতার হানি হয়েছে এবং সেজন্য আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে জ্ঞানের ফসল ফলে নি। এই কারণে আমাদের মানসিক অধঃপতন ঘটেছে। এই অধঃপতন থেকে বাঙালি মনকে রক্ষা করার জন্য প্রমথ চৌধুরী কলম ধরেছেন, একথা একাধিক বার ঘোষণা করেছেন! প্রমথ চৌধুরী যে বীরবল, ভারতচন্দ্র, ফরাসি সাহিত্যিক ও ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রাদের ভক্ত ছিলেন, তা এজন্য যে এঁদের রচনায় ইমোশন্‌-এর অতিচর্চা নেই, রিজন্‌ বা যুক্তির আশ্রয় আছে।

তিনি আমাদের মানসিক যৌবনের চর্চা করার উপদেশ দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ শারীরিক যৌবনের চর্চা করেছে ও সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য এই যৌবনের জয়গানে ও তার অবসানে বিলাপে মুখরিত। সবুজপত্রে তিনি ইউরোপীয় যৌবন—যা চিরস্থায়ী মানসিক যৌবন—তার চর্চা এবং ইউরোপীয় প্রাণের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। আমাদের মন সর্বদা ঘুমিয়ে থাকে। তাকে জাগিয়ে তোলাই প্রমথ চৌধুরীর ও সবুজপত্রের সাধনা। এজন্যই তিনি সাহিত্যের চর্চায় নেমেছেন। "সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়। কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।" ('সবুজ-পত্রের মুখপত্র')। সবুজপত্রে তিনি জাড্য, আলস্য ও তামসিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেছেন: "আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে, শ্মশানবৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে, উপবাসকে উৎসব বলে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই।" (তদেব)। 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরীর রচনায় তাই মানসিক যৌবনের নিত্য মহোৎসব, সেখানে যুক্তি ও বুদ্ধির রাজত্ব, ইমোশন্‌ ও বোধির সেখানে প্রবেশ নিষেধ। গৌড়ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে "পাকস্থ" করার সাধনাই তাঁর জীবন-সাধনা। ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধান প্রভেদ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, "সে দেশের লোক 'অজরামরবৎ' বিদ্যা ও অর্থের চর্চা করে, আর আমরা 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা' ধর্মচিন্তা করি।" ('মহাভারত ও গীতা')। ইউরোপের জীবনদর্শনই তাঁর পছন্দ

এবং বাঙালি তার জীবনে একেই গ্রহণ করুক, এই তাঁর একান্ত অভিলাষ।

॥ ৩ ॥

বাঙালি বীরবল তাঁর সাহিত্যে হাসির চর্চা করেছেন। বাঙালিকে তিনি হাসির চর্চা করতে বলেছেন কেননা হাসির জন্ম সত্যদর্শন থেকে। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে পর্যালোচনা করার ক্ষমতা যাঁর আছে, তিনিই দার্শনিক; আর হাস্যরসিক সে অর্থে জীবনের দার্শনিক। বীরবল ও ভারতচন্দ্রের কিস্‌সা ও কাব্যে হাসির ছড়াছড়ি। হয়ত সর্বত্র শিষ্টতা রক্ষিত হয় নি, তথাপি হাসির আলোয় জীবনকে সত্যরূপে দেখা যায়। 'হাস্যরস যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় আরিষ্টফেনিস থেকে আরম্ভ করে আনাতোল ফ্রাঁস পর্যন্ত সকল হাস্যরসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিষটাই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের সত্যের বক্রদৃষ্টি।" ('ভারতচন্দ্র')। প্রমথ-সাহিত্য তাই বীরবল-ভারতচন্দ্র-আনাতোল ফ্রাঁসের পথানুসারী।

বাংলা সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই হাসির চর্চা প্রয়োজন, একথা প্রমথ চৌধুরী বলেছেন। আমাদের সমাজ-জীবনে ও রাষ্ট্র-জীবনে যে দৈন্য ও ভিক্ষা-মনোবৃত্তি বিশ শতকের প্রথমার্ধে বারবার লক্ষ্য করা গিয়েছে, তার অবসান তিনি কামনা করেছেন। পরাধীন দরিদ্র অধঃপতিত বাঙালি জাতি জীবনে একটি অধিকার বুঝে নিয়েছে, তা হল কাঁদবার অধিকার। প্রথম চৌধুরী এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন: "আমরা কাঁদতে পেলে যত খুশি থাকি, এমন আর কিছুতেই নয়। আমরা লেখায় কাঁদি, বক্তৃতায় কাঁদি। আমরা দেশে কেঁদেই সন্তুষ্ট থাকি নে, চাঁদা তুলে বিদেশে গিয়ে কাঁদি।······কান্না ব্যাপারটাকে একটা কর্তব্যকর্ম করে তোলা শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব হয়েছে।" ('খেয়াল-খাতা')। তার ফলে কি সাহিত্যে, কি রাজনীতিতে, কি ব্যক্তিজীবনে তরলতা, অতিরোমান্টিকতা, জ'লো

ভাবোচ্ছ্বাস, খেলো বাগাড়ম্বর প্রাধান্য লাভ করেছে, সর্বত্রই ফোঁস-ফোঁস কান্না, নাকী সুরের কান্না এবং তাতেই আমরা বলিহারি যাই। জাতীয় চরিত্রের এই অধঃপতনে প্রমথ চৌধুরী দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এবং সে কারণেই ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বিলাপ না করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কড়া মন্তব্যের চাবুক মেরে তিনি বাঙালিকে বাস্তব-বর্তমান-যুক্তি-সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।

অতিকান্নার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রমথ চৌধুরী প্রস্তাব করেছেনঃ "করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে; আমাদের সুখের জন্য না হোক্ স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।" ('খেয়ালখাতা')। বাঙালি বীরবল তাই কান্নার বদলে হাসির, সস্তা তরল রোমান্টিকতার বদলে মননশীলতার চর্চা করতে চেয়েছেন এবং নির্ভয়ে ঘোষণা করেছেন, "আশা করি, যে হাসতে জানে না সেই যে সাধু পুরুষ ও যে হাসতে পারে সেই যে ইতর, এ হেন অদ্ভুত ধারণা এ দেশের লোকের মনে কখনো স্থান পাবে না। আমি লোকের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়াটা নৃশংসতা মনে করি"। ('ভারতচন্দ্র')।

'সনেট-পঞ্চাশৎ' কাব্যগ্রন্থে এই মনোভাবের সমর্থক কয়েকটি সনেট পাই। প্রবন্ধে তাঁর যা বক্তব্য, সনেটে সেই একই বক্তব্য। এখানে মাত্র দুটি সনেট উদ্ধার করব। আমার বিশ্বাস, এর থেকেই বাঙালি বীরবলের সম্পূর্ণ পরিচয় ধরা পড়বে।

'ভারতচন্দ্র' ও 'খেয়াল-খাতা' প্রবন্ধের উপরি-ধৃত মন্তব্য নিচয়ে জীবনে কান্নার বিরুদ্ধে ও হাসির স্বপক্ষে 'বীরবল' যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, অবিকল তারই প্রতিধ্বনি শুনি 'হাসি ও কান্না' সনেটেঃ

সত্য কথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি
দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল,
কথায় কথায় যাহে ভরে আসে জল,—
আমি খুঁজি চোখে চোখে আনন্দের হাসি।
আর আমি ভালবাসি বিদ্রূপের হাসি,
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মম অনল

দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি।
হৃদয়ে কৃপণ হয়ে ধনী হতে চায়,—
সুখ তারা দেয় নাকে, তাই দুঃখ পায়।
তাই আমি নাহি করি দুঃখেতে মমতা,
সুখী যারা, তারা মোর মনের মানুষ।
হাসিতে উড়ায় তারা নিষ্ঠুর ক্ষমতা,
মনে জেনে বিশ্ব শুধু রঙীন ফানুষ।

'ব্যর্থ জীবন' সনেটে 'বীরবল' বলেছেন, 'পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব।' এ-কথা এক শ'বার সত্য। 'আমি বাঙালি জাতির বিদূষক মাত্র': প্রমথ চৌধুরীর এই উক্তি বিনয়োক্তি। তিনি বাঙালি মনের মুক্তিদাতা। অন্ধ দেশাভিমান, জাত্যভিমান, মোহ ও বৃথা গর্ব থেকে তিনি বাঙালি-মনকে মুক্ত করে বিশ্বপথের মাঝে ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের সমস্ত বাগাড়ম্বর ও অত্যুক্তি অগ্রাহ্য করে এই সংযতবাক্ যুক্তিধর্মী ব্যঙ্গপ্রবণ জীবনশিল্পী আমাদের জীবনকে, যৌবনকে, বস্তুরূপকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন। সমস্ত তারল্য ও অতিরেক বর্জন করে যুক্তির আশ্রয়ে জীবনকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গভীর অনুরাগ ও বেদনা বহন করে এই জীবন-রসিক, বাঙালিকে আত্মধিক্কার, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মদর্শনের আলোয় স্বপ্রতিষ্ঠ হতে বলেছেন; সেই বেদনাসিক্ত ব্যঙ্গরসিক জীবনশিল্পীর কণ্ঠে তীব্র ভর্ৎসনা শুনেছি 'বার্ণার্ড শ' সনেটে:

সভ্যতার প্রিয়শত্রু, বার্ণার্ড শ,
সমাজের তুমি দেখ শৃঙ্খল আচার,
শিকল-বিকল-মন মানুষ নাচার,
তব শাস্ত্র শুনে তাই তারা হয় থ!
মানুষেতে ভালবাসে হ য ব র ল,
তারি লাগি সয় তারা শত অত্যাচার।
স্পষ্ট বাক্যে প্রাণ প্রায়, যে করে বিচার,—
অন্যের পায়ের নীচে পড়ে যায় দ!
মানবের দুঃখে মনে অশ্রুজলে ভাসো,
অপরে বোঝে না, তাই নাটকেতে হাসো॥

হয় মোরা মিছে খেটে হই গলদঘর্ম,
নয় থাকি বসে, রাখি করেতে চিবুক।
এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক!

এই সনেট প্রমথ চৌধুরীর যথার্থ আত্মপরিচয়। বাঙালির প্রিয়শত্রু 'বীরবল' তাঁর সমগ্র সাহিত্যসাধনায় যে জীবনধর্মে আমাদের দীক্ষা দিতে চেয়েছেন, তার পর্যালোচনা ও বাস্তব-রূপায়ণেই প্রমথ-সাহিত্য-চর্চার সার্থকতা নির্ভর করে।

বীরবলের আত্মকথা

বহু বছর আগের কথা। গত শতকের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ তখন পদ্মাপালিত মধ্যবঙ্গে নদীতে বোটে বাস করতেন। পদ্মা ও তার শাখানদীগুলির সঙ্গে সেদিন রবীন্দ্র-মানসের একটি অন্তরঙ্গ যোগ সাধিত হয়েছিল। সেই অন্তরঙ্গ ভালবাসার পরিচয় ছড়িয়ে আছে 'ছিন্নপত্রে'। ১১ই আগস্ট ১৮৯৩ তারিখে পতিসর থেকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাবক্ষে জীবন-যাপনের বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন—"অনেকগুলো বড়ো বড়ো বিলের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে।...ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকায় অনেকগুলো ছোক্‌রা ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—

যোবতী, ক্যান্‌ বা কর মন ভারী।
পাবনা থাক্যে আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোটরি।"

পাবনা থেকে একটাকা মূল্যের মোটরি কিনে এনে দিলে যুবতীর হালকা মন হয়, এই আশ্বাসে কবি কৌতুক বোধ করেছিলেন, এবং লিখেছিলেন—"আমরাও ও-ভাবের ঢের (গান) লিখেছি, কিন্তু ইতরবিশেষ আছে। আমাদের যুবতী মন ভারী করলে তৎক্ষণাৎ জীবনটা কিংবা নন্দন-কানন থেকে পারিজাতটা এনে দিতে প্রস্তুত হই; কিন্তু এ অঞ্চলের লোক খুব সুখে আছে বলতে হবে, অল্প ত্যাগস্বীকারেই যুবতীর মন পায়।"

পাবনা থেকে মোটরি এনে দিলেই যুবতীকে খুশি করা যায়, এ-সংবাদ রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে পাবনা থেকে আর একটি মূল্যবান রত্ন এসেছে, সেটি হল প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল। এজন্য আমরা পাবনার কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। তাঁর নিজের কথায়ঃ "বাড়ি বলতে আমি সেই স্থানই বুঝি, যেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের বাস।" বীরবলের জন্ম যশোরে,

কিন্তু যশোরের স্মৃতি অতি ক্ষীণ এবং যশোরকে কখনই তিনি আপন ব'লে স্বীকার করেননি।

প্রমথ চৌধুরীর বাল্যকাল কেটেছে কৃষ্ণনগর, পাবনা ও বিহারে, প্রথম যৌবন কৃষ্ণনগর ও কলকাতায়, মধ্য-যৌবন কলকাতা ও বিলেতে এবং শেষ জীবন শান্তিনিকেতনে। এর ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বনাগরিক, বৈদগ্ধ্য তাঁর প্রথম গুণ, সূক্ষ্ম মননশীলতা ও বক্রকটাক্ষসমন্বিত দৃষ্টি তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং বুদ্ধির মুক্তি তাঁর মুখ্য সাধনা।

পিতৃপুরুষের বাসভূমি পাবনা জেলার হরিপুর ও পিতার কর্মস্থল নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর: এ দুই স্থানের প্রভাব প্রমথ চৌধুরীর জীবনে সবিশেষ বর্তমান। 'আত্মকথা'য় তিনি বলেছেন—"আমি ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগরেই বাস করতুম সাড়ে এগারো মাস ও হরিপুরে পনেরো দিন। কিন্তু হরিপুর আমরা সঙ্গেই এনেছিলুম, তার মানসিক আবহাওয়াও।" হরিপুর গ্রামটি তাঁর খুব ভালো লাগত, এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন। হরিপুর গ্রামটি চৌধুরীবংশের জমিদারী-ভুক্ত ছিল। হরিপুর গ্রাম ও কৃষ্ণনগর শহর—এ দুয়ের প্রভাব প্রমথ চৌধুরীর উপর পড়েছে।

চৌধুরীবংশের দুটি প্রভাব বাল্যেই তাঁর উপর মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। এক—হাসির চর্চা, দুই—উদার জীবনসম্ভোগ। 'আত্মকথা'র প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে: "আমাদের পরিবারের পুরুষেরা ছিলেন সুপুরুষ, আর আমার খুড়ি-জেঠিরা সব ছিলেন গৌরবর্ণ। আর প্রায় সকলেই ছিলেন চালাক-চতুর। তাদের ছিল হাসিমুখ ও কথায় বার্তায় এঁরা হাসির চর্চা করতেন।" পুনশ্চ, "আমাদের পরিবার ছিল গোঁড়া হিন্দু; তার অর্থ এই যে হরিপুরের চৌধুরীরা সমাজের প্রচলিত প্রথা মেনে চলতেন, কিন্তু তাঁদের প্রকৃতিতে ভক্তির লেশমাত্র ছিল না।...বৃদ্ধরা কাশী যেতেন দেহত্যাগ করতে, আর আমি আমার এক জেঠতুতো ভাইকে দেখেছি যিনি কিছু দিন কাশীতে গিয়েছিলেন, শিক্ষালাভ করতে। কিসের শিক্ষা জানিনে—কিন্তু শিখে এলেন শুধু তলোয়ার খেলা আর তীর ছোঁড়া।" চৌধুরীবংশে শিকারী ও গায়ক-বাদক দুই-ই ছিল।

গ্রাম ও শহর, শিকার ও গীতবাদ্য, জমিদারী ও মানসিক বৈদগ্ধ্য: এই পরস্পরবিরোধী সংস্কারের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী মানুষ হয়েছিলেন,

একথা স্মরণযোগ্য। বীরবলের গল্পে যেমন সিতিকণ্ঠ সিংহ ঠাকুরের মতো দুর্দান্ত শিকারী-বীণকার-জমিদার আছেন, তেমনি 'চার-ইয়ারি কথা'র প্রেমিক-বন্ধুরাও আছেন।

হরিপুর থেকে কৃষ্ণনগর, সেখান থেকে দ্বারভাঙ্গা, পুনর্বার কৃষ্ণনগর, তারপর মজঃফরপুর ভাগলপুর, সেখান থেকে আরা; তারপর কলকাতা, দার্জিলিং, রাজশাহী, পুনর্বার কৃষ্ণনগর, আবার কলকাতা, সেখান থেকে বিলেত: জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর এইভাবে যাযাবরের মতো প্রমথ চৌধুরী ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার সুফল হয়েছে এই—তিনি ধর্মপ্রভাবমুক্ত উদার জীবনরসিক হতে পেরেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর গুরু কৃষ্ণনগরের রাজসভাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর; শ'; ভোল্‌তেঅর, দোদে, আনাতোল ফ্রাঁস, মলেআর; ভাস ও রবীন্দ্রনাথ। তাই বলতে পারি প্রমথ চৌধুরী বাঙালি লেখক নন, আধুনিক জগতের লেখক।

॥ ২ ॥

এহেন বিশ্বনাগরিক প্রমথ চৌধুরীর আত্মজীবনী কী হতে পারে? তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্যসাধনা এটাই প্রমাণ করেছে, তিনি যৌবনের ও তারুণ্যের, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের ও চঞ্চল ইয়োরোপের, প্রগতি-ভাবনা ও মননশীল চিন্তার প্রতিনিধি। তিনি একই সঙ্গে ভারতচন্দ্র ও ভাস, শ' ও রবীন্দ্রনাথ, আনাতোল ফ্রাঁস ও বীরবলের ভক্ত। তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রথম ও শেষ কথা—সংস্কারলেশহীন দৃঢ় ঋজু মনের চর্চা, তার পরিপাটি ঈষৎ বক্র বহিঃপ্রকাশ এবং কুজ্মটিকাশূন্য ভাবাবেগমুক্ত নির্মোহ বুদ্ধির জয়ঘোষণা। সুতরাং তাঁর যথার্থ আত্মজীবনী তাঁর সাহিত্য, তাঁর যোগ্য পরিচয় তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনামে—'বীরবল' উপাধিতে।

ব্যঙ্গের কশাঘাতে আমাদের মনকে নিদ্রারাজ্য থেকে উদ্ধার করে জাগ্রত করে তোলাই 'সবুজপত্র'র ও 'বীরবল' এর সাধনা, একথা তিনি বার বার বলেছেন। বস্তুত সেখানেই তাঁর সত্য পরিচয়। এখানে তাঁর সামাজিক কীর্তিকাহিনী (বিশেষ কিছু না) বা বংশগত কৌলীন্য (অধুনা তার কোন দাম নেই) অবান্তর। একমাত্র সনেটে প্রমথ

চৌধুরী নিজের সত্য পরিচয় স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সনেট-সুন্দরীর প্রেমে পড়ে তিনি মুহূর্তের জন্য ব্যঙ্গশিল্পীর নির্মোক খুলেছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সচেতন হয়ে সেটি আবার পরিধান করেছেন।

তথাকথিত সামাজিক সাফল্যকে ব্যঙ্গ করে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন:

মুখস্থে প্রথম কভু হইনি কেলাসে
হৃদয় ভাঙ্গেনি মোর কৈশোর-পরশে।
কবিতা লিখিনি কভু সাধু-আদিরসে।
যৌবন-জোয়ারে ভেসে, ডুবিনি বিলাসে॥…
পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব॥
অন্যে কভু দিই নাই নীতি-উপদেশ।
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি, দেশে কি বিদেশে।
বুদ্ধি তব নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ।
তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে!

['ব্যর্থজীবন', সনেট-পঞ্চাশৎ]

আবার কখনো ব্যঙ্গভরে আত্মকথা লিখেছেন:

নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন,
আমার হৃদয় যাচে বাহুর বন্ধন।
কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল,
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,—
মনোঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়িনে লাটাই!

['আত্মকথা', তদেব]

আবার কখনো বা ক্রুদ্ধ হয়ে বার্নার্ড শ'-র কাছে আবেদন করেছেন:

এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক!

[বার্নার্ড শ', তদেব]

আবার বন্ধুর কাছে মনের কথা বলেছেন:

তোমাতে আমাতে আছে মিল এইমাত্র—
ঠকিতে যদিও শিখি, শিখিনে ঠকামি।

জীবনে জ্যাঠামি আর সাহিত্যে ন্যাকামি
দেখে শুধু আমাদের জ্বলে যায় গাত্র,
কারো গুরু নই মোরা প্রকৃতির ছাত্র,
আজো তাই কাঁচা আছি, শিখিনি পাকামি।

['বন্ধুর প্রতি', পদচারণ]

তত্রাচ কখনো বা তিনি সত্যকথা গভীর সুরে বলেছেন :

জীবনের দিবসের স্বল্প পরিসর,
ঘিরে তারে আছে ঘন অনন্তের ছায়া।
যদিচ ধরেছি সবে দুদিনের কায়া,—
হাসির, কাজের, তবু আছে অবসর।

['হাসি', সনেট-পঞ্চাশৎ]

বলেছেন :

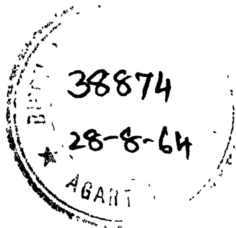
আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ,
কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা।
হৃদয়-ফকির জপে 'লা-আল্লা-ইলাল্লা',
আকাশেতে শুনি বাণী 'মুস্কিল-আশান'!

['মুস্কিল-আশান', তদেব]

পরমুহূর্তেই এই নির্বেদ কাটিয়ে উঠে বলেছেন :

সত্য কথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি
দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল,
কথায় কথায় যাহে ভরে আসে জল,—
আমি খুঁজি চোখে চোখে আনন্দের হাসি॥
আর আমি ভালবাসি বিদ্রূপের হাসি,
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মম অনল
দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি॥…
তাই আমি নাহি করি দুঃখেতে মমতা,
সুখী যারা, তারা মোর মনের মানুষ।
হাসিতে উড়ায় তারা নিষ্ঠুর ক্ষমতা,
মনে জেনে বিশ্ব শুধু রঙীন ফানুষ॥

['হাসি ও কান্না', তদেব]



বীরবলের সত্য পরিচয় এখানে বিধৃত হয়েছে। ভারতচন্দ্র রায়ের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি এইটির উপর জোর দিয়েছেন—"কেবল কাব্যের গুণে প্রমোদের প্রভু"। ভারতচন্দ্রের স্বকৃত পরিচয়ের এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। 'বীরবল' বলেছেন—ঐ কথা শুনে আমরা দুটি জিনিসের পরিচয় পাইঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ হয়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচেনি, এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করতে পারিনি, করেছিল শুধু 'প্রমোদের প্রভু'। এই প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিস্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিন্‌কালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়। যে লোক ইউরোপে দ্বিতীয় শেক্‌স্‌পীয়ার বলে গণ্য, সেই সেরভাণ্টেসের জীবন বিষয় দুঃখময় ছিল, অথচ তাঁর হাসিতে সাহিত্যজগৎ চির-আলোকিত। এই হাসিকে ইউরোপীয়েরা বলেন বীরের হাসি। এ জাতীয় হাসির ভিতর যে বীরত্ব আছে তা অবশ্য পল্টনী বীরত্ব নয়, ব্যবহারিক জীবনের সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করবার ভিতর যে বীরত্ব আছে, তাই। এই হাসির মূলে কি আছে ভারতচন্দ্র নিজেই বলে দিয়েছেন। তার কথা হচ্ছে এই—

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী॥

['ভারতচন্দ্র', নানা কথা]

প্রমথ চৌধুরী তাঁর কর্মজীবনের ব্যর্থতা ও জীবনের চিরসঙ্গী রোগের আক্রমণ সত্ত্বেও যে 'প্রমোদের প্রভু' ছিলেন, তার কারণ তিনি ছিলেন চেতনামুখী, তাঁর চিত্ত ছিল সদানন্দে পূর্ণ, তিনি ছিলেন সদাসুখী। উজ্জ্বল চঞ্চল নির্মম বিদ্রূপের অনলে তাঁর চিত্তাকাশ উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং সে-আলোয় বাঙালি জীবন ও সাহিত্যের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। এই তাঁর সত্য পরিচয়।

॥ ৩ ॥

তথাপি প্রমথ চৌধুরী আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন জীবনের অপরাহ্ণে। তখন তিনি শান্তিনিকেতনে স্বেচ্ছানির্বাসিত। প্রতিভা-অনল

তখন প্রায় নিভে এসেছে। প্রৌঢ় অপরাহ্নের প্রশান্তি নেমেছে। কিন্তু বিদ্রূপের অনল ও ব্যঙ্গ-স্ফুলিঙ্গের দীপ্তি বর্তমান। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর ছয় বছর আগে, বাহাত্তর বছর বয়সে তিনি 'আত্মকথা' লেখা শুরু করেন অল্পায়ু 'রূপ ও রীতি' পত্রিকায়। জন্ম থেকে বিলাতযাত্রা পর্যন্ত (১৮৬৮-১৮৯৩)—জীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের কাহিনী 'আত্মকথা' নামে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালের বিবরণ 'বৈশাখী' (১৩৫২) ও 'পূর্বাশা' (১৩৬০) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ এবং গ্রন্থভুক্ত হয়নি। (দ্রঃ—শ্রীপুলিনবিহারী সেন-কৃত গ্রন্থসূচী, প্রবন্ধ-সংগ্রহ ২।)

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন (৭ আগষ্ট) প্রমথ চৌধুরীর জন্মদিন। 'আত্মকথা' লিখতে প্রমথ চৌধুরী শুরু করেন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-বৎসরের পূর্ববছরে। ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে আত্মজীবনী রচনা চলেছে। এই সময়ে প্রমথনাথের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র কালীপ্রসাদ, শাশুড়ী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যান। মৃত্যুর বিষণ্ণ ছায়া তখন তাঁকে ঘিরে আছে, তাঁর নিজের দিনও শেষ হয়ে আসছে, ভগ্নহৃদয়ে ভগ্নস্বাস্থ্যে সে ইঙ্গিত তিনি পেয়েছেন। আশ্চর্য এই—'আত্মকথা'র কৈফিয়তে যে বিষণ্ণ বাতাবরণের পরিচয় রয়েছে, মূল কাহিনীতে তার ছায়াপাত হয়নি। 'হাসি ও কান্না' সনেটের কথা পুনর্বার মনে পড়ে—

সত্য কথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি
দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল।

দুঃখে তিনি মমতা করেননি, বিদ্রূপের হাসিতে তিনি দুঃখ-শোকের ঘনান্ধকার দূর করেছেন, বিশ্বকে রঙীন ফানুস জেনে তাকে ঠাট্টা করেছেন এবং ঠাট্টা করেই চিরবিদায় নিয়েছেন। কী মানসিক বল ও সবল প্রাণের অধিকারী হলে, এ কর্ম করা সম্ভব, তা শুধু অনুমেয়। এই আত্মকাহিনী পড়লে মনে হয় না যে, একজন চিররুগ্ন ভগ্নহৃদয় জীবনপ্রান্তে উপনীত প্রৌঢ়ের আত্মকথা। কৌতুকে হাসিতে বিদ্রূপে ব্যঙ্গে 'আত্মকথা' উজ্জ্বল। প্রভাতের অজস্র আলোকধারা ও মধ্যাহ্নের খররৌদ্র, উভয়ই এখানে বর্তমান। সেই-যে সাহিত্য-জীবনের গোড়ায় তিনি বলেছিলেন—"করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁত্‌সেঁতে হয়ে উঠেছে; আমাদের সুখের জন্য না হোক, স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক

দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যদি কেউ বলে, আমাদের এই দুর্দিনে হাসি কি শোভা পায়। তার উত্তর, ঘোর মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিতেও কি বিদ্যুৎ দেখা দেয় না কিংবা শোভা পায় না। আমাদের এই অবিরতধারা অশ্রুবৃষ্টির মধ্যে কেহ-কেহ যদি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে আমাদের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হবার একটা সম্ভাবনা হয়।" ('খেয়ালখাতা': ১৯০৫)। পঁয়ত্রিশ বছর পরে জীবন সায়াহ্নে সেই প্রতিজ্ঞা প্রমথ চৌধুরী অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তার প্রমাণ 'আত্মকথা'।

এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ মামুলি আত্মজীবনী নয়। এতে কেবল সাহিত্যশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যজীবনের—তাঁর মনের ও ভাষায় ভিত্তিনির্মাণের ইতিহাস মাত্র নয়; এতে দুনিয়াদারীর পরিচয় আছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর যে কত গভীর অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তার পরিচয় এখানে পাই। 'আত্মকথা'র ভূমিকা-লেখক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন—"প্রথম বয়স থেকেই প্রমথবাবু মিশেছেন সকল শ্রেণীর নানা লোকের সঙ্গে। আমরা অনেক সময় রহস্য করে বলেছি যে ছয় কোটি বাঙালির মধ্যে প্রমথবাবু চার কোটি লোককে চেনেন। এবং যার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয় তার শরীর ও মনের চেহারা ও ভাবভঙ্গী তাঁর মনে এঁকে যায়। আর মনে করলেই তার শব্দচিত্র অসাধারণ কৌশলে লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এর পরিচয় তাঁর ছোটগল্পে ছড়ান রয়েছে। এই আত্মকথা সাহিত্য হিসাবে তাঁর ছোটগল্পের মতই তীক্ষ্ণ ও রসাল।"

গল্পের আকর্ষণ সাহিত্যের প্রবলতম আকর্ষণ। সেই আকর্ষণে এবং স্বাদু উপভোগ্য কথনভঙ্গীতে এই 'আত্মকথা' জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যৎসামান্য উদাহরণেই তা বোঝা যাবে। কৃষ্ণনগরে কৈশোরে প্রমথ চৌধুরী ব্রজবাবুর ইস্কুলে পড়তেন। সেখানকার নানা চমকপ্রদ রসাল বিবরণ 'আত্মকথা'য় আছে। চৌধুরীমহাশয় বলেছেন—"লাস্ট ক্লাসের গিরিশ পণ্ডিত আমাদের নীতি উপদেশ দিতেন। তাঁর একটি উপদেশ আমার আজও মনে আছে। তিনি বলেছিলেন যে, মাছমাংস কখনো খেয়ো না, যেমন আমি খাই নে। তবে মাছের ও মাংসের ঝোল খেয়ো যেমন আমি খাই; আর ঝোলের সঙ্গে যদি দু-এক টুক্‌রো মাছ

'কি মাংস আসে, তা খেতে পারো। যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও—এই বলে।"

এই ধরণের নানা বিচিত্র কাহিনীর রসাল বর্ণনায় 'আত্মকথা' পরিপূর্ণ। কেবল কৃষ্ণনগরে নয়, কলকাতা, বেহার, লণ্ডন—সর্বত্রই লেখকের এই সহজ প্রসন্ন রসিকতা বর্তমান।

কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণের কথা স্বীকার করেছেন প্রমথ চৌধুরী। বলেছেন—"আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল, কিন্তু আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর।" ব্রাত্যজীবনে, গানে মশ্‌করায় আলাপচারিতায় কেচ্ছায় ভাষার প্রাণশক্তির সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। জীবনে ও সাহিত্যে যে উদারতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, তার মূলে আছে কৃষ্ণনগরের জীবনযাত্রা। তাঁর ছেলেবেলায় কৃষ্ণনাগরিকরা পঞ্জিকাশাসিত ছিলেন না, তাঁদের ধর্মের গোড়ামি ছিল না। এই ধর্মগোড়ামিমুক্ত উদার জীবনবোধ বীরবলী সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। "যার মুখের ভাষা ভাল; সেও সে ভাষাকে ইচ্ছা করলে বাঁকাতে ঘোরাতে পারে। ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতার সন্ধান কৃষ্ণনগরিকরা জানতেন, এরই নাম বাক্‌চাতুরী।...এজন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী।...সেকালে যারা ছোক্‌রা ছিল, তাদের মধ্যে দুজন লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর আমি। আমরা দুজনেই কৃষ্ণনাগরিক। আমাদের দুজনেরই খেলায় আর গুণের অভাব থাক—রসিকতার অভাব নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট রচনার নাম হাসির গান আর বীরবলের কথা কান্নার বস্তু নয়।"

কৃষ্ণনগরের জীবনে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না, এটা প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে সুফলদায়ী হয়েছিল। জীবনের সর্বস্তর থেকে আনন্দ-আহরণের দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল। সে-পরিচয় 'আত্মকথা'য় রয়েছে। নেড়ানেড়ীর গজল হোক বা মার্গসংগীত-ই হোক—সর্বত্রই তিনি আনন্দ পেতেন। ঐ গজলের একটু পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

নেড়ার উক্তি : যদি গৌর চাস্‌ কাঁথা নে ধনী।
সকালবেলা ভিক্ষেয় যাবি
ঘরে এসে তেল মাখাবি,
আধ্ব পেতে দিবি বিছানাখানি।

আর গাঁজার কল্‌কেয় আগুন দিবি দিবস-রজনী।
নেড়ীর উক্তি : এ-পূজোতে ঝুমকো দিবি, তবে ঘরে রইব।
…ইত্যাদি।

এ-সব গীতে রুচির উৎকর্ষ বা সংগীতের মাহাত্ম্য কিছুই নেই, এগুলি উপভোগ করার ক্ষমতা যে প্রমথনাথের ছিল, তার থেকে প্রমাণ হয় তিনি ছিলেন জীবন-রসিক। এইটি ফরাসী জীবনের বিশিষ্ট লক্ষণ। শ্লীল-অশ্লীলের শুচিবায়ু ফরাসীদের মতো বীরবলের ছিল না, ছিল জীবনের প্রতি বিপুল আগ্রহ।

ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগরের সেতারের বোল—'বৌ-কথা-কও পাখী ছিল ডালেতে বসে, তাদের মারলি কি দোষে!' এ যেমন তিনি উপভোগ করেছেন, তেমনি তাঁর প্রথম যৌবনে বর্তমান শতকের গোড়ায় কলকাতার জনপ্রিয় সংগীত 'আয় লো অলি কুসুম তুলি' আর 'যমুনা-পুলিনে বসি কাঁদে রাধা বিনোদিনী' সমান উপভোগ করেছেন। তখনো রবীন্দ্রনাথের গান প্রচলিত হয়নি। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, যিনি সাহিত্যের সাত সাগরের নাবিক, রবীন্দ্র-সাহিত্যের বোদ্ধা, সংস্কৃতির শিখরে শিখরে যাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার, তিনি কিভাবে এইসব সাধারণ রুচির গান উপভোগ করতেন। জীবনকে গ্রহণ করবার যে বিপুল আগ্রহ ও প্রচণ্ড শক্তি প্রমথ চৌধুরীর ছিল, তাই তাঁকে একাধারে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও জনসাধারণের বয়স্য করে তুলেছে। ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের প্রতি ও মার্গসংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে, সে-কথা এখানে তিনি কবুল করেছেন।

নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী অবলীলাক্রমে মিশতে পারতেন, তার প্রমাণ 'আত্মকথা'য় পাই। উপরিউক্ত গীতগুলির রসোপভোগে তাঁর দিক থেকে কোনো বাধা ছিল না। প্রমথ চৌধুরীর প্রথম সাহিত্যরচনা : দুটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ ও 'জয়দেব' প্রবন্ধ। ফরাসী লেখক মেরিমে-র 'ফুলদানি' ও 'কার্মেন' তর্জমা তিনি করেছিলেন। প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিল, দ্বিতীয়টি অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত। এপ্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—" 'কার্মেন' অনুবাদ করার কারণ, তার বিষয়বস্তু 'ফুলদানি'র চাইতে ঢের বেশি অসামাজিক। সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকেই আমার ধাতে ছিল না। এবং প্যুরিটানিজম্‌কে আমি

কোনকালেই একটা গুণের মধ্যে গণ্য করিনি। তার পরিচয় আমার 'জয়দেব' নামক প্রবন্ধেও পাবেন।"

সহাস্য রসিকতা ও শুচিবায়ুমুক্ত জীবন-সম্ভোগ বীরবল-সাহিত্যের মূলে আছে। এখানে তারই স্বীকৃতি। নিজেকে নিয়েও তিনি এমন সব রসিকতা করেছেন যা সব সময় তথাকথিত ভদ্রতার গণ্ডী রক্ষা করে চলেনি। দুটি মাত্র উদাহরণ এখানে উদ্ধার করছি। দুটিই রবীন্দ্র-সম্পর্কিত; প্রথমটিতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়; দ্বিতীয়টিতে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের প্রথম দর্শনলাভের সুযোগ—যা তিনি হেলায় ত্যাগ করেন।

প্রথম বিবরণ :

"হেয়ার ইস্কুলে আমি ক্রমে আবিষ্কার করি যে, অনেকের কাছে আমি 'ললিতা' বলে পরিচিত ছিলুম। আমি একটি ছোক্‌রাকে একদিন জিজ্ঞাসা করি এ নামের অর্থ কি?—সে বলে, 'তুমি রবীন্দ্রনাথের "ভগ্নহৃদয়" পড় নি?' আমি বলি, 'না'। সে বলে, 'একখানি "ভগ্নহৃদয়" কিনে পড়, তাহলেই জানতে পারবে যে, ললিতার সঙ্গে তোমার কি মিল আছে।' তার কথায় আমি 'ভগ্নহৃদয়' কিনে পড়ি। রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। আমি 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে মুগ্ধ হই নি, এবং ললিতার সঙ্গে আমার মিল কোথায়, তাও বুঝতে পারি নি। 'ভগ্নহৃদয়'-এ দুই-চারিটি প্রাকৃতিক বর্ণনা আমার খুব ভাল লাগে।"

দ্বিতীয় বিবরণ :

"আমি কলকাতায় পঠদ্দশায় দুটি ব্যক্তির দর্শনলাভের সুযোগ পেয়েছিলুম, কিন্তু সে সুযোগ গ্রহণ করি নি। সেই দুজনই ভবিষ্যতে আমার জীবন ও মন অধিকার করেন। একজন হচ্ছেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। বোধহয় ১৮৮৪ খৃঃ সরস্বতী পূজোর দিন, হঠাৎ গরম পড়ায় আমি হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেন থেকে হেঁটে প্রেসিডেন্সি কলেজের দক্ষিণের মাঠে উপস্থিত হই। এসে দেখি আমার বন্ধু নারায়ণপ্রসাদ শীল সেখানে একটি গাছতলায় শুয়ে আছেন। তিনি আমাকে বল্লেন যে অ্যাল্‌বার্ট হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি একটা বক্তৃতা করছেন, আর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর একটি বালিকা

ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। আর বল্লেন, ‘চল না, রাস্তাটা পেরিয়ে আমরা অ্যাল্‌বার্ট হলে যাই।’ আমি তাঁর এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলুম না, কারণ আমি শ্রান্ত বোধ করছিলুম। নারায়ণ বল্লেন, ‘রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা না শুনতে চাও, অন্তত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দেখে আসি চল। শুনেছি মেয়েটি নাকি অতি সুন্দরী।’ আমি উত্তর করলুম, ‘পরের বাড়ীর খুকি দেখবার লোভ আমার নেই।’ ফলে আল্‌বার্ট হলে না গিয়ে নারায়ণ আর আমি সেই গাছতলাতেই শুয়ে থাকলুম। পরে সে মেয়েটিকেই আমি বিবাহ করি।”

এই গল্প দুটি যদি সত্য হয়, তবে বীরবলী রসিকতা কী বস্তু তা কেবল অনুমেয়; আর যদি নিছক গল্প হয় তাহলে খাসা গল্প, এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য। কেবল বাংলাদেশ ও সমাজকে নিয়ে নয়, নিজেকে উপলক্ষ্য করে রসিকতা করার বিরল ক্ষমতা বীরবলের ছিল, এ তারই পরিচয়স্থল।

॥ ৪ ॥

‘আত্মকথা’ পড়লে টের পাওয়া যায় প্রমথ চৌধুরী রূপলোকের অধিবাসী ছিলেন। তিনি যে রূপের উপাসক ছিলেন, সে পরিচয় তাঁর ব্যক্তিজীবনে ও সাহিত্যজীবনে ছড়িয়ে আছে। তিনি বাঙালিকে কেবল বুদ্ধি ও যুক্তির পথে চালনা করেছেন, তা নয়; তাকে সুন্দরের, রূপের, ইন্দ্রিয়-উপভোগের পথে চালাতে চেয়েছেন। তিনি আমাদের রংছুট গান-ছুট্ ধূসর জীবনে সবুজ রং অর্থাৎ নবীন যৌবনের রং লাগাতে চেয়েছিলেন, আমাদের বৈরাগ্য-তামসিকতাকে নির্মম ব্যঙ্গ করেছিলেন। ইন্দ্রিয়-উপভোগের যে প্রত্যক্ষ জগৎ সে-জগতেই প্রমথ চৌধুরীর মানস-বিহার; রূপলোক তাঁর প্রার্থিত স্বর্গ।

এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য স্মরণযোগ্য: “ইন্দ্রিয়জ বলে বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন; কেননা, ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধনসূত্র। এবং ঐ সূত্রেই রূপের জন্ম। অন্তরের রূপও যে আমাদের সকলের মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে না, তার প্রমাণস্বরূপ একটা চলতি উদাহরণ নেওয়া যাক।

"রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি অনেকের বিরক্তির কারণ এই যে, সে লেখার রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ইথার আছে, তাই সে মনের ভিতর দিয়ে যে ভাবের আলো রিফ্র্যাক্‌টেড হয়ে আসে তা ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত ও ছন্দে মূর্ত হয়ে আসতে বাধ্য। স্থূলদর্শীর স্থূলদৃষ্টিতে তা হয় অসত্য নয় অশিব বলে ঠেকা কিছু আশ্চর্য নয়।...

"যার রূপজ্ঞান আছে, সে সৌন্দর্যের চর্চা এবং সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করতে বাধ্য—তার আশু সামাজিক ফলাফল উপেক্ষা করে, কেননা রূপের পূজারীদেরও বিশ্বাস যে, রূপজ্ঞানের শেষফল ভালো বই মন্দ নয়।...

"আর যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি নে তা হলে আমাদের সুন্দরভাবে মরাই শ্রেয়ঃ। তাতে পৃথিবীর কারও কোনো ক্ষতি হবে না, এমনকি আমাদেরও নয়।" ['রূপের কথা', বীরবলের হালখাতা।]

'আত্মকথা' রূপলোকের অধিবাসীর রচনা। এতে তীক্ষ্ণতা, সহাস্য রসিকতা ও ভূয়োদর্শিতার সঙ্গে মিলেছে প্রগাঢ় বৈদগ্ধ্য, সূক্ষ্ম মননশীলতা ও নির্মেঘ সূর্যকরের মতো বুদ্ধির আলোক।

'আত্মকথা'র কৈফিয়তে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—"নিজের জীবনে অতীত বলে কিছু নেই। যা আছে, তা একটি প্রকাণ্ড বর্তমান। যদিচ বর্তমান বলে একটি মুহূর্তও নেই। যাকে আমরা বলি বর্তমান, সে হচ্ছে অতীত এবং ভবিষ্যতের কাল্পনিক সন্ধিক্ষণ মাত্র।"

প্রমথ চৌধুরী যৌবনের ও বর্তমানের পূজারী। বর্তমানের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি অন্যত্রও আছে। তিনি বলেছেন—"আমাদের ভবিষ্যৎও নেই অতীতও নেই। এক বাকি থাকল বর্তমান। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যকে এখন থেকে এই বর্তমান নিয়েই কারবার করতে হবে। এ অবশ্য মহা মুশকিলের কথা। বই পড়ে বই লেখা এক, আর নিজে বিশ্বসংসার দেখেশুনে লেখা আর। একাজ করতে হলে চোখ-কান খুলে রাখতে হবে, মনকে খাটাতে হবে; এককথায় সচেতন হতে হবে। তারপর এত কষ্ট স্বীকার করে যে সাহিত্য গড়তে হবে, সে সাহিত্য সকলে সহজে গ্রাহ্য করবেন না। মানুষে বর্তমানকেই সব-চাইতে অগ্রাহ্য করে। যাঁদের চোখকান বোজা আর মন পঙ্গু, তাঁরা

এই নবসাহিত্যকে নবীন বলে নিন্দা করবেন। তবে এর মধ্যে আরামের কথা এই যে, বর্তমানের কোনো ইতিহাস নেই, সুতরাং এখন হতে বঙ্গসরস্বতীর ঘাড় থেকে ভূত নেমে যাবে।" [‘প্রত্নতত্ত্বের পারশ্য-উপন্যাস’, বীরবলের হালখাতা।]

শুচিবায়ুমুক্ত জীবন-সম্ভোগেচ্ছা ও অতীতের পিছুটানমুক্ত বর্তমানের উপাসনা, নবীন যৌবনের প্রতিষ্ঠা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের আরাধনা—প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-সাধনার মূল কথা। ‘আত্মকথা’য় তার শেষ পরিচয় জীবনের প্রদোষে প্রমথ চৌধুরী রেখে গেলেন। অথচ ‘আত্মকথা’র আকাশ প্রভাতের আকাশ, সেখানে সহাস্য রসিকতার প্রসন্ন কিরণধারা ঝরে পড়েছে, মোহমুক্ত বুদ্ধির জয় ঘোষিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন প্রমথ চৌধুরীর জন্মদিন। আর প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুদিন (২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬)?—সেদিন কেউ তাঁর সঙ্গী নয়। বাংলা সাহিত্যে তিনি যে-পথে যাত্রা করেছিলেন, তা অপরিচিত নোতুন পথ। তাঁর জীবৎকালে কয়েকজন সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন, সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য। আজো সে-পথ বিরলপথিক। প্রমথ চৌধুরীর যথার্থ বোদ্ধা পাঠকসমাজের পরিধি আজো খুব বিস্তৃত নয়। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই পরিধির বিস্তার হবে ও অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা বাড়তে থাকবে, এই আশ্বাসেই বর্তমান আলোচনার সমাপ্তি।

সবুজপত্র ও বাংলা সাহিত্যে মোহমুক্তি

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সবুজপত্রের প্রকাশ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন পর্বের সূচনা হল। সে পর্ব কেবল চলতি গদ্যের বিজয়াভিযান-পর্ব নয়, তা সাহিত্যে মোহমুক্তিরও পর্ব। প্রমথ চৌধুরী যে বাংলা গদ্যের চর্চা করলেন সবুজপত্রের পাতায়, তা পুরোপুরি মুখের ভাষা নয়, স্ল্যাঙ্ বা আটপৌরে ভাষাও নয়, তা কতকটা চল্‌তি, তবু শিষ্ট, সংযত বাচনভঙ্গী।

বাংলা সাহিত্যে সবুজপত্রে প্রবন্ধের ফসল ফলেছে। সে তুলনায় কবিতা গল্পের ফসল পরিমাণে কম। আমাদের সাহিত্য-দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রমথ চৌধুরী বদলে দিতে চেয়েছিলেন। এবং একটি শক্তিমান প্রবন্ধকার গোষ্ঠী তৈরী করে সে কাজে সাফল্যও লাভ করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী একটি বিদগ্ধ নাগরিক রুচিবান পরিপাটি মনের অধিকারী ছিলেন। সবুজপত্রের সকল লেখাতেই এই পারিপাট্য ও নাগরিকতার ছাপ পড়েছে। সবুজপত্রের প্রবন্ধাবলীর বৈশিষ্ট্য কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, এই বিদগ্ধ রুচিবান নাগরিক মানস সৃষ্টিতে। এই মানস বিদেশী সাহিত্যক্ষেত্র থেকে প্রচুর শস্য আহরণ করেছে, বাঙ্গালী তথা ভারতীয় চরিত্র ত্যাগ করে ধীরে ধীরে বৈশ্বিকতা লাভ করেছে, নিছক কল্যাণবুদ্ধি ত্যাগ করে নির্মোহ বিশুদ্ধ চিন্তার পোষকতা করেছে। ফলে এই মানসিকতা কতকটা উন্নাসিক হয়েছে, এই কথা অনস্বীকার্য।

প্রমথ চৌধুরী যে কটি গুণের চর্চায় বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছিলেন। তা হল যুক্তি বিচারে শ্রদ্ধাশীলতা, প্রসাদগুণ (ক্ল্যারিটি) ও দৃঢ় প্রকৃতিস্থতা (স্যানিটি), মার্জিত রসিকতা ও নিবিড় ঐহিকতা, সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও পরিশীলিত সংস্কৃতিবোধ।

এই কটি গুণের প্রকাশ কেবল চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধতেই দেখা গিয়েছে তা নয়, সবুজপত্র-গোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকের প্রবন্ধতেও লক্ষ্য করা যায়। অব্যবহিত পূর্ববর্তী পর্বের প্রবন্ধাকারবৃন্দের (যেমন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়-

চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) লেখায় যে মানসিকতা লক্ষ্য করা গিয়েছে, তা সবুজপত্র পর্বের মানসিকতা থেকে ভিন্নতর। পূর্বোক্ত দলের লক্ষ্য দেশ-কাল-সমাজ, শেষোক্ত দলের লক্ষ্য বিশ্ব-নাগরিকতা বৈদগ্ধ্যমার্জিত বুদ্ধির উদ্বোধন। পূর্বোক্তের দৃষ্টিভঙ্গী কল্যাণমুখী, শেষোক্তের আগ্রহ রুচির পরিশীলন ও মার্জনায়।

তাই সবুজপত্রের মানসিকতা দেশজ মানসিকতা নয়, একথা বলা যেতে পারে। সবুজপত্রের প্রবন্ধাবলী প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বাঙালি পাঠককে মুক্তি দিয়েছিল। সে মুক্তি কিসের মুক্তি? রক্ষণশীলতা ও সঙ্কীর্ণতার অন্ধ গুহা থেকে মুক্তি, জাত্যভিমান ও শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা থেকে মুক্তি, ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাস থেকে মুক্তি। স্বতন্ত্র ঋজু নির্মোহ চিন্তার খর সূর্যালোকে বাংলা প্রবন্ধ রাজ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এই সামান্য লক্ষণগুলি সবুজপত্র গোষ্ঠীর সকল লেখকের রচনাতেই উপস্থিত।

সবুজপত্রের পরিচয় কেবল তার সংগ্রামী চরিত্রে নয়, তার সুরের ঐক্যে, সবুজপত্রীদের সমধর্মিতায়। এর ফলে সবুজপত্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যখন "বিশিষ্ট সাহিত্যকে অবলম্বন করে একটি মাসিকপত্র প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে" রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন, তখন তিনি মণিলালকে বলেছিলেন "তুমি যে কাগজ বের করবে, তাতে পাঠকদের দেবার বরাদ্দটাই বড় কথা নয়, লেখকদের উপর দাবীর কথাটা তার চেয়েও বড়ো কথা। দাবী অর্থযোগে বা শব্দযোগে প্রবন্ধ চাওয়া নয়—কাগজের চরিত্রের মধ্যেই সে দাবী থাকবে, সে চরিত্র অলক্ষিতে লেখককে উদ্বুদ্ধ করে সাবধান করে; লেখার অপরিচ্ছন্নতা শৈথিল্য চিন্তার দৈন্য আপনিই সঙ্কুচিত হয়। অন্ততঃ আপন উত্তরীয়টিকে ধোপ দিয়ে না আনলে মান রক্ষা হয় না। তোমার পত্রিকার একটা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থাকা চাই—অর্থাৎ অন্যের প্রতি নিজের ব্যবহারেও তার তপস্যা থাকবে, নিজের প্রতি অন্যের ব্যবহারকেও সে সৃষ্টি করে তুলবে।"

সবুজপত্রের এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ছিল। পত্র সম্পাদনায় এই তপস্যা ও সৃষ্টির যাথার্থ্য লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সে কথা বার বার স্মরণ করেছেন।

প্রথম চৌধুরীর ভাষাতেই এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ভাবালুতা, অস্পষ্টতা, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি, বিশৃঙ্খল-পদান্বয়, অকারণ বিশেষণ বাহুল্য, অনুরূপ ক্রিয়াপদের একঘেয়েমি—বাংলা গদ্যের এই সব দুর্লক্ষণ প্রমথনাথ তাঁর রচনায় সমূলে উচ্ছেদ করেছেন। এর পেছনে একটি পরিশীলিত নাগরিক বিদগ্ধ সহাস্য মনের অস্তিত্ব অনুভব করি। বাংলা গদ্যের যে একটি পরিমিত, সুসভ্য, সংযত, ব্যঙ্গনিপুণ, তীক্ষ্ণাগ্র উজ্জ্বল চেহারা "বীরবলী" গদ্যে দেখি, তা আসলে ঐ মনেরই বহিঃপ্রকাশ।

এবং এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত নয়, তা গোষ্ঠীগত, সবুজপত্রীদের সকল লেখাতেই এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। ভাবালুতা ও সংস্কারমোহের বিরুদ্ধে লড়াই, নির্মোহ বুদ্ধি ও যুক্তির উপাসনা, বিশ্ব-সংস্কৃতির আনন্দ যজ্ঞে অংশ গ্রহণ ও তারই আলোয় নিজ সাহিত্য-সংস্কারের পরিমার্জনা এ সবই সবুজপত্রীদের লেখায় নির্ভুল ভাবে উপস্থিত।

সবুজপত্র কি ধরণের পত্রিকা হবে, কি রকমের লেখা ছাপা হবে, লেখকের ও পাঠকের কাছে তার প্রত্যাশা কী হবে, এ নিয়ে প্রথম সংখ্যাতেই (বৈশাখ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ) প্রমথ চৌধুরী আলোচনা করেছেন। এই ব্যক্তব্যই সবুজপত্রের সকল রচনার মূল সুরু। তাতে চৌধুরী মহাশয় বলেছেন "সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্রমণ্ডিত সাহিত্যের নব শাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তা হল আমরা বাঙ্গালী জাতির সবচেয়ে যে বড় অভাব, তা কতকটা দূর করতে পারব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা, তারি জ্ঞান। আমরা যে আমাদের সে অভাব সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনি তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে, আলস্যকে ঔদাস্য বলে, শ্মশানবৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে, উপবাসকে উৎসব বলে নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল, সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মরক্ষার জন্য আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্ম-প্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না—কিন্তু

তাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।" এই নির্মম বাক্য-চাবুক মেরে বাঙ্গালী পাঠক মনকে জাগিয়ে তোলার সার্থক স্পর্ধা করেন প্রমথ চৌধুরী।

এখানেই শেষ নয়। বাংলা সাহিত্য আর দেশজ থাকবে না, তা হবে দেশোত্তর, সে কথাও এই ভূমিকায় 'বীরবল' বলেছিলেন। কেবল দেশীয় প্রেরণাই যথেষ্ট নয়, চাই বিদেশী দক্ষিণা-পবন,—"ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিত মুক্তি লাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে সেই আনন্দ হতেই আমাদের নবসাহিত্যের সৃষ্টি। সুন্দরের আগমনে হীরা মালিনীর ভাঙা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটেছিল, ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে তেমনি সাহিত্যের ফুল ফুটেছে। তার ফল কি হবে, সে কথা না বলতে পারলেও এই ফুল ফোটা যে বন্ধ করা উচিৎ নয়, এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা। সুতরাং যিনি পারেন, তাকেই আমরা ফুলের চাষ করবার জন্য উৎসাহ দেব।"

ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রাণের যে লীলা দেখা গেছে, 'বীরবল' তাকেই বাংলা সাহিত্যে আনতে চেয়েছিলেন। জাড্যলেশহীন তারুণ্যের সাধনাই যথার্থ সাহিত্য-সাধনা বলে ভেবেছিলেন। "এই নূতন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে তা মনে প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিযে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্ত্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে দিতে পারে তবেই তা পরে সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হবে, আমরা আশা করি, আমাদের এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করবার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে। সাহিত্য গড়তে কোনও বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম।...ইংরাজী শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও তার চারা তুলে বাংলার মাটিতে বসাতে হবে। নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না।"

সবুজপত্রে এই তারুণ্যের সাধনা প্রাণের জয়ঘোষণা : আত্মপ্রবঞ্চনা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে লড়াই ; মানসিক ঔদার্য ও আত্মসংযমের সাধনা ; দেশ নয়, দেশোত্তর প্রেরণার আহ্বান, সংহত পরিপাটি রচনার প্রযত্ন ও যুক্তিভিত্তিক নির্মোহ দৃষ্টির প্রসার লক্ষ্য করা গিয়াছে। কেবল গোষ্ঠীপতির লেখায় নয়, গোষ্ঠীর ছোট-বড় সকলের রচনাতেই এই যুক্তি ও মোহমুক্তি, সংযম ও শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়, এখানেই সবুজপত্রের সার্থকতা।

বীরবলী গল্প

ইংরেজী উপন্যাসের প্রবর্তক ফীলডিং দম্ভভরে বলেছিলেন, "গল্প-উপন্যাসের রাজ্যে সমালোচকের কোনো শাসন চলবে না। এ-রাজ্যে আমি যা বলব, তাই হবে।" ফীলডিং-এর এই দম্ভ যতটা অন্যায় শোনায়, আসলে ততটা অন্যায় নয়। গল্প-উপন্যাস সত্যই কোনো সাহিত্য-অনুশাসন মেনে চলে না। গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয় না এমন কিছু ভূ-ভারতে নেই। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, যৌনসমস্যা, রাজনীতি, দেশপ্রেম, ব্যক্তিক রাগ-অনুরাগ, মানবিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম, সব কিছুই এই রাজ্যের এক্তিয়ারে পড়ে। এর থেকে মনে হয়, ফীলডিং-এর দম্ভ ও দাবি অনুচিত নয়।

বাংলা সাহিত্যের শীতরিক্ত কুঞ্জে যখন ইউরোপের দক্ষিণ-পবন এসে পৌছল, তখন আবার ভাঙা ডাল সতেজ হল, নতুন করে কুঁড়ি ধরল, ফুল ফুটল। সুন্দরের আগমনে যেমন হীরা মালিনীর কুঞ্জে ফুল ফুটেছিল, ইউরোপীয় ভাবধারার আগমনে তেমনি বাংলা সাহিত্যের কুঞ্জে নতুন ফুল ফুটল। বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁসের এই ব্যাখ্যা আমার একার নয়, নিতান্ত অন্ধ দেশভক্ত বাদে বাকী সবাই এই সত্য স্বীকার করবেন। সবুজপত্রের অধিনায়ক প্রমথ চৌধুরী এই কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতেন।

প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় কেবল বিদূষণে—পরের মনোরঞ্জনে নয়, পাঠকের খোসামুদিতে নয়, প্রয়োজনমত বাঙালি পাঠককে অপ্রিয় কড়া কথাও তিনি শুনিয়েছেন। তার প্রমাণ "বীরবলের হালখাতা", "নানা কথা", "বীরবলের টিপ্পনি"। তাঁর ছদ্মনাম বীরবল সার্থক নাম, কেননা রাজা বীরবলের মত বুদ্ধি ও সাহস, উইট ও হিউমর, আর্ট ও নলেজ—তাঁর করায়ত্ত ছিল। ফল কথা, তিনি বাগে পেলে কাউকে ছাড়তেন না, এবং রেখে-ঢেকে বলতেন না। সুতরাং এ-হেন ব্যক্তি যে তাঁর বিশুদ্ধ সাহিত্য-চর্চাতেও এই স্বভাবের পরিচয় রেখে যাবেন, তা আর বিচিত্র কী! কবিতা ও গল্প রচনাতে প্রমথ চৌধুরীর সেই দক্ষতাই

ছিল যে-দক্ষতার পরিচয় রয়েছে উপরোক্ত প্রবন্ধাবলীতে। বস্তুত ফরাসীসুলভ বিদগ্ধ অনুশীলিত মনের অধিকারী প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যকে অনেক জঞ্জালের কবল থেকে রক্ষা করেছেন তাঁর অপ্রিয় সত্যভাষণের দ্বারা, নির্মম সম্মার্জনী চালনার দ্বারা, সবল অধিনায়কতার দ্বারা। সুতরাং ফীলডিং-এর মত দম্ভোক্তি করার অধিকার ও ক্ষমতা প্রমথ চৌধুরীর ছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য। আর তিনি তা করেওছিলেন, তার প্রমাণ "পদাচরণ" কবিতা-সংকলনের উপহার-পৃষ্ঠা। তাতে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে এই সংকলন উপহার দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "গদ্যের কলমে-লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক্, আছে—rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ—reason।"

প্রমথ চৌধুরী যে শাণিত কলমে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেই কলমেই গল্প-কবিতা লিখেছিলেন। তাই দৃষ্টিভঙ্গি উভয়ত্রই এক। তিনি যে আপন পথ থেকে কখনও ভ্রষ্ট হননি, তার যথেষ্ট প্রমাণ সবুজপত্রের পাতায় ছড়ান রয়েছে। গল্পের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী স্বতন্ত্র রুচির পরিচয় দেবেন, এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ। সমালোচকদের ভ্রূভঙ্গিতে তিনি যে ফীলডিং-এর মতই ভয় পাননি, তার প্রমাণ এই ক'টি চরণ:

সমালোচকের প্রতি

তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে,
তোমাদের কড়া কথা শুনে!
তার চেয়ে ভাল শতগুণে
দেয়া চির লেখায় অলম্,
তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম।

পুনশ্চ, 'বার্নার্ড শ' সনেটে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন:

এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক!

আবার, 'ব্যর্থ জীবন' সনেটে শ্লেষ-ভরা কণ্ঠে বলেছেন :

পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব॥

এই শেষ চরণটি প্রমথ চৌধুরীর খাঁটি সত্য কথা : 'পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব।' সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর গল্পে বাঙালি পাঠকের সাধারণ প্রত্যাশা তৃপ্ত হবে না, বরং বিপরীতটাই ঘটবে। তাঁর গল্পে দুটি জিনিস নেই—যা সাধারণ বাংলা গল্পে ভূরি ভূরি আছে—জ্যাঠামি ও ন্যাকামি। তত্ত্ব-উপদেশ দানে এবং আদর্শ প্রেমের অবাস্তব প্রতিমা-চিত্রণে চৌধুরী মশায়ের সমান অনীহা। 'বন্ধুর প্রতি' সনেটে তিনি এ-কথাই বলেছেন :

লোকে বলে আছে তব কিঞ্চিৎ ক্ষ্যাপামি
তথাপি আমার তুমি চির-প্রিয়পাত্র।
তোমাতে আমাতে আছে মিল এইমাত্র—
ঠকিতে যদিও শিখি, শিখিনি ঠকামি।
জীবনে জ্যাঠামি আর সাহিত্যে ন্যাকামি
দেখে শুধু আমাদের জ্বলে যায় গাত্র,
কারো গুরু নই মোরা, প্রকৃতির ছাত্র,
আজো তাই কাচা আছি, শিখিনি পাকামি।
নীতি আর রাজনীতি আর ধর্মনীতি,
যত গরু গুরু সেজে শিক্ষা দেয় নিতি।
প্রিয় শিষ্য কারো নই তুমি আর আমি,
আমাদের রোগ খোঁজা গুরুবাক্যে মানে,—
অথচ এদেশে সবে ঠিক মনে জানে,
যা-কিছু বোকামি নয় তাহাই ক্ষ্যাপামি।

এই অভিমতের প্রতিধ্বনি শুনি 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে। "সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া,—কারো মনোরঞ্জন করা নয়।·· কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়,—কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।" ("বীরবলের হালখাতা" গ্রন্থ)।

সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর গল্পে গুরুগম্ভীর সনাতনী উপদেশ খুঁজতে

গেলে আমরা ব্যর্থ হব, সামাজিক উপকার বা অন্যায়ের প্রতিকারের হদিশ সেখানে পাব না। খেলাচ্ছলে শিক্ষা বা গল্পচ্ছলে উপদেশ দানের মহৎ ব্রত প্রমথ চৌধুরীর ছিল না। সুতরাং নীতিবাগীশ বা ব্যবসায়ী (অর্থাৎ যিনি গল্প পড়ে কিছু লাভ খোঁজেন) পাঠক প্রমথ চৌধুরীর গল্প পড়বেন না, এটাই লেখক চেয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের এইটুকু ভূমিকা।

॥ ২ ॥

অথ কথারম্ভ। প্রমথ চৌধুরী অজস্রপ্রসূ লেখক ছিলেন না, তিনি বাংলা সাহিত্যে দিয়েছেন ধূলিমুষ্টি—কিন্তু তা স্বর্ণমুষ্টি। গল্পও তিনি খুব বেশি লেখেন নি। যা লিখেছেন, তা আঙুল গুণে বলে দেওয়া যায়।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় 'চার-ইয়ারী কথা'র (১৯১৬)। এটি একটি গল্প নয়, চারটি গল্পের সমষ্টি। একদা আসন্ন ঝড়বৃষ্টির মুখে স্তব্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্লাবঘরে বসে হাতে মদের গেলাস নিয়ে চার বন্ধু আপন আপন প্রেমের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছিলেন। ক্লাবঘরের সেই পটভূমিকায় চার বন্ধু কথকতা করেছিলেন। গল্পগুলির বাহ্যত সাদৃশ্য এই পর্যন্তই। কিন্তু আন্তরসাদৃশ্য আরও গভীরে। প্রেমের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের যে সনাতন ধারণা আছে, তা লেখক বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন এইসব অভিজ্ঞতার দ্বারা। প্রথম সেনের কথা। এক পূর্ণিমার রাত্রে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে একটি পূর্ণযৌবনা অপূর্ব-সুন্দরী ইংরেজ রমণীর সঙ্গে সেনের সাক্ষাৎ হয়। সেদিন জ্যোৎস্না কলকাতায় অপূর্ব মোহ বিস্তার করেছিল। সেই আলোর বন্যায় মেয়েটিকে দেখামাত্র সেন প্রেমে পড়ে গেলেন, মেয়েটি সম্মতি জানিয়ে হাসল। তারপরই মোহভঙ্গ। মিনিট কয়েকের মধ্যেই প্রকাশ পেল মেয়েটি পাগল, পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এসেছিল। রক্ষকেরা এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। সেই উন্মাদিনীর অট্টহাসি ও কান্না সেনের সমস্ত স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিল। সেনের কথা,—"সেদিন থেকে চিরকালের জন্য ইটার্নাল ফেমিনাইনকে হারিয়েছি। কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।"

দ্বিতীয় গল্প—সীতেশের কথা। তিনি "অনেকের ভিতরে ইটার্নাল ফেমিনাইনকে" পেতে চেয়েছিলেন। ফল হয়েছে, সেনের মত তিনিও তা পাননি। একদা লণ্ডনে বর্ষার সন্ধ্যায় উদ্দেশ্যহীনভাবে সীতেশ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, একটি পুরানো বইয়ের দোকানে একটি হাস্যমুখী মোহময়ী ইংরেজ রমণীর সঙ্গে দেখা হল এবং সীতেশ সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমে পড়ে গেলেন ও পুনর্বার সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি ভিক্ষা করলেন। মেয়েটি একটি কার্ড দিয়ে চলে গেল। পাঁচ মিনিট বাদে সীতেশ তা পড়ে দেখলেন—তাঁকে ঠকিয়ে সীতেশের গিনি ক'টি নিয়ে সে পালিয়েছে। প্রেমিকা ঠক ও পিকপকেট হয়ে অন্তর্হিতা হল।

এবার তৃতীয় গল্প—সোমনাথের কথা। অনিদ্রা রোগে ভুগে সোমনাথ ইংলাণ্ডের সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্ট শহরে বায়ু পরিবর্তনে গিয়েছিলেন। সেখানে হোটেলে একটি স্নেহময়ী সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাকে সোমনাথ সেভিয়ার—তারিণী ওরফে "রিনি" বলে ডাকতেন। এই রিনিকে সোমনাথ ভালবেসেছিলেন এবং বছরখানেক সে-পর্ব চলেছিল। রিনিও সোমনাথের জন্য ব্যাকুল হ'ত। যেদিন এ-খেলা চুকল, সেদিন বোঝা গেল রিনি তাকে উপায়স্বরূপ ব্যবহার করেছিল, প্রণয়প্রার্থী জর্জের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে বিবাহটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চেয়েছিল। সোমনাথের ও জর্জের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে এই মোহিনী নিজের কাজ উদ্ধার করেছিল।

চতুর্থ গল্প—রায়ের কথা। গল্পকথকের নিজ অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র। লণ্ডনে বাস করার সময় রায় যে বাড়িতে থাকতেন, সে বাড়ীতে "আনি" নামে একটি দাসী ছিল। রায় তাকে দেখেছিলেন সেবাপরায়ণারূপে। আনি তাকে ভালবাসত, কিন্তু সে তা প্রকাশ করে নি। রায় তাকে দেখলে মুখ নামিয়ে থাকতেন, পাছে অভদ্রতা হয়। তারপর দীর্ঘ দশ বছর বাদে কলকাতায় এক রাত্রে টেলিফোনে আনি তার এই গোপন ভালবাসার কথা রায়ের কাছে প্রকাশ করল। এবং তা কোথা থেকে? পরলোক থেকে। নার্স আনি যে মুহূর্তে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায়, সেই মুহূর্তে। এ-খবর শুনে রায় ফোন ছেড়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

চার বন্ধুর প্রেমের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাদের সমস্ত অভ্যস্ত

সংস্কারকে বিচলিত ও প্রেম-সম্পর্কিত রোমান্টিক ধারণাকে বিপর্যস্ত করে। এই গল্পগুলি সাধারণ প্রেমের গল্প নয়। মনে হয়, চৌধুরী মহাশয় আমাদের প্রেম সম্পর্কিত রোমান্টিক ধারণাকে ভেঙ্গে দেবার জন্য এই গল্পগুলি রচনা করেছেন। অথচ গল্পগুলির আকর্ষণ সে-কারণে ক্ষুণ্ণ হয়নি। বিশুদ্ধ গল্পরস ও বিচিত্র স্বাদের জন্য এবং অনুপম বর্ণনায় এগুলি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, একথাও অনস্বীকার্য। তবে এ গল্পগুলির সম্পদ কোথায়? তা অন্যত্র। নীতিশাসনমুক্ত দায়িত্ববর্জিত বেপরোয়া যৌবনের প্রাণচাঞ্চল্যের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে এগুলিতে। আর সেইজন্যই এই চার বন্ধুকে আমরা উপহাস করি না, সমব্যথী হই। এ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন—"চারইয়ারী কথার যেটুকু শাঁস সেটুকু একটি রক্তিম হৃদয়ের পদ্মরাগমণি, যেমন উজ্জ্বল, তেমনি করুণ। ইচ্ছা করলেই আর একখানা 'চারইয়ারী' লেখা যায় না, কেননা ইচ্ছা করলেই আর একবার তরুণ হওয়া যায় না, আর একবার ফুল (fool) হওয়া যায় না। দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করে প্রথম যৌবনের সোয়ান-সং (swan-song) গাওয়া হয়েছে ওতে।" এই মন্তব্যের পর অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

॥ ৩ ॥

"আহুতি" গ্রন্থটি কয়েকটি গল্পের সংকলন। বিচিত্র ও বিরোধী রসের সমাবেশ ঘটেছে এই গ্রন্থে। 'আহুতি' গল্পে দেখি, একদা সমৃদ্ধিশালী অধুনা ধ্বংসস্তূপ রুদ্রপুরের উপর দিয়ে পাল্কি করে যাবার সময় লেখকের মনে রুদ্রপুরের ঐশ্বর্যের ও পতনের ছবিটি ফুটে উঠেছে। এই গল্পে কারুণ্যের উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে ভয়ানক রস। অধুনা ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে যে হীন হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার এখানে অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে। রুদ্রপুরের বিধবা রানী রত্নময়ীর পুত্রকে হত্যা ও তার প্রতিক্রিয়ায় রত্নময়ীর অদ্ভুত প্রতিহিংসা সাধন এই ঘটনার বর্ণনায় করুণ ও ভয়ানক রস একত্র প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটির বর্ণনায় এমন বৈপরীত্যের সমাবেশ হয়েছে যে, তা আমাদের অসাড় মনকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। জমিদার-বংশের পতন ও তা

নিয়ে হাহাকার, এ বিষয়ে অজস্র বাংলা গল্প লেখা হয়েছে, কিন্তু এখানে এই ভয়ানক রসের সঙ্গে করুণ রসের পরিণয় সাধিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। গল্পের সূচনায় যে প্রাকৃতিক বর্ণনাটি দেওয়া হয়েছে, তা এই মন্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করি: "গ্রামে আগুন লাগলে যে রকম হয়, আকাশের চেহারা সেই রকম হয়েছে। অথচ আগুন লাগবার অপর লক্ষণ,—আকাশ-জোড়া হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শুনতে পেলুম না। চারিদিক এমন নির্জন, এমন নিস্তব্ধ যে, মনে হল মৃত্যুর অটল শান্তি যেন বিশ্বচরাচরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।...এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠল, চারিদিক থেকে এলোমেলোভাবে বাতাস বইতে লাগল। সেই বাতাসের তাড়নায় আকাশের আগুন যেন পাগল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। আকাশের রক্তগঙ্গায় যেন তুফান উঠল, চারিদিকে আগুনের ঢেউ বইতে লাগল। তারপর দেখি, সেই অগ্নি-প্লাবনের মধ্যে অসংখ্য নরনারীর ছায়া কিলবিল করছে, ছটফট করছে। এই ব্যাপার দেখে ঊনপঞ্চাশ বায়ু মহানন্দে করতালি দিতে লাগল, হা হা হো হো শব্দে চীৎকার করতে লাগল। ক্রমে এই শব্দ মিলে-মিশে একটা অট্টহাস্যে রূপান্তরিত হল,—সে-হাসির নির্মম বিকট ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে ঢেউ খেলিয়ে গেল। সে-হাসি ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আবার সেই মৃদু, করুণ ও কাতর ক্রন্দনধ্বনিতে পরিণত হল।" এই "বিকট হাসি ও করুণ ক্রন্দনের" বিপরীত সমাবেশের পটভূমিকায় গল্পটি গ্রথিত হয়েছে। পুত্রহারা রত্নময়ীর দুঃখে আমরা বেদনার্ত হই, কিন্তু শোকপ্রকাশের অবকাশ পাই না।

প্রমথ চৌধুরীর যে বৈশিষ্ট্য প্রবন্ধে প্রকাশিত, এই গ্রন্থের অপর পাচটি গল্প তাকেই পুনর্বার প্রকাশ করেছে। "বড়বাবুর বড়দিন", "একটি সাদা গল্প", "ফরমায়েসি গল্প", "ছোট গল্প" এবং "রাম ও শ্যাম"—এই পাঁচটি গল্পেরই একটি করে মর‍্যাল আছে।

প্রেম, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, আমাদের রাজনীতি—এই তিন বিষয়ে উপরোক্ত গল্পগুলি লিখিত হয়েছে। "বড়বাবুর বড়দিন" গল্পে নীতিবাগীশ মধ্যবিত্তের চারিত্রিক বিশুদ্ধতা-দুর্গে প্রমথ চৌধুরী ফাটল আবিষ্কার করেছেন। বড়বাবু ভবানীবাবু সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারলেন না, তার কারণ তাঁর স্বভাবেই নিহিত।

অত্যন্ত হাস্যকর অবস্থায় ফেলে বড়বাবুকে অপদস্থ করা হয়েছে। শেষকালে লেখক ঠাট্টা করে বলেছেন, "এ গল্পের মর‍্যাল এই যে, পৃথিবীতে ভাল লোকেরই যত মন্দ হয়,—এই হচ্ছে ভগবানের বিচার"। আসলে এটি বিশুদ্ধ সামাজিক স্যাটায়ার এবং নীতিবাগীশদের পিঠে বীরবলের চাবুক মাত্র।

"রাম ও শ্যাম" গল্পে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতির যে চিরন্তন দুর্বলতা, তাকে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। স্বরাজের নামে আমরা যে দলাদলি করি, লেখক অতি দুঃখে সেই কথাটাই রাম ও শ্যামের ছবি এঁকে দেখিয়েছেন। এই গল্পের মর‍্যাল গল্পের শেষে "পুনশ্চ" টীকায় সংযোজিত হয়েছে। তা এইঃ "এ গল্প পড়ে আমার গৃহিণী বলেন,—কৈ, গল্প ত শেষ হল না? আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে উত্তর করলুম—এ গল্পের মজাই ত এই যে, এর শেষ নেই। এ গল্প এ-দেশে কবে যে শুরু হয়েছে—তা কারও স্মরণ নেই, আর কখনও যে শেষ হবে, তার কোনও আশা নেই। এ-গল্প যদি কখনো শেষ হত, তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এ-পৃথিবীর সব চাইতে বড় ট্রাজেডি হত না।"

"একটি সাদা গল্প"-এ বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের বয়স্থা মেয়ের বিবাহের ট্রাজেডি চিত্রিত হয়েছে। বাপের বয়সী দোজবরে গ্রামপতির সঙ্গে মেয়ের বিবাহ—অর্থাৎ মেয়েকে বলিদানঃ বাংলা সাহিত্যে এ নিয়ে অনেক গল্প লেখা হয়েছে। এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্র লিখেছেন 'বামুনের মেয়ে", "অরক্ষণীয়া"—আর প্রমথ চৌধুরী "একটি সাদা গল্প"। প্রমথ চৌধুরী বিনা উচ্ছ্বাসে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের এই নিষ্ঠুর ট্রাজেডিকে বিবৃত করেছেন, কিন্তু তাতেই ক্ষান্ত হননি; শেষে এই মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন, "বর-কনেতে যে মন্ত্র পড়ছিল, তা প্রথমে আমার কানে ঢোকেনি, তারপর হঠাৎ কানে এল, ক্ষেত্রপতি (দোজবরে বুড়ো) বলছেন, 'যদস্তু হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'। একথা শোনামাত্র আমি উঠে চলে এলুম। বুঝলুম এ অভিনয় সত্যিকার জীবনের, তবে তা Comedy কি ব্যক্তি Tragedy, তা বুঝতে পারলুম না।" এখানেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।

"ফরমায়েসি গল্প"-এ বীরবল বাংলা রোমান্টিক গল্প-কাহিনী-

উপন্যাসের শবব্যবচ্ছেদ করে তার মধ্যে যে অসম্ভাব্য হাস্যকর গাঁজা-খুরি উপাদান আছে, সেগুলিকে টেনে বার করেছেন এবং বাস্তবের কঠিন ভূমিতে তাদের আছড়ে ফেলেছেন। মকদমপুরের জমিদার রায়মশায়ের বৈঠকখানায় সান্ধ্য আসরে ইয়ার-বক্সির সভায় চাটুকার ঘোষাল রায়-মশায়ের ফরমায়েস অনুযায়ী প্রেমের গল্প বলতে শুরু করল। তারপর রায়মশায় ও সভাপণ্ডিতের নির্দেশানুযায়ী জাত-কুল-মান বাঁচিয়ে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিয়ে দিল। বিরোধী উক্তি-প্রত্যুক্তি ও বিচিত্র দাবির সমন্বয়ে ঘোষাল যে-বস্তুটি উপস্থিত করল, তা অত্যন্ত হাস্যকর। এ-গল্পে স্পষ্টই বাংলা রোমান্সের উপর কশাঘাত করা হয়েছে।

"ছোটগল্প" আর একটি গল্প—যার মর‍্যাল "জীবনটা ট্রাজেডি নয়, কমেডিও নয়, কারণ সংসারটা হচ্ছে একসঙ্গে ও দুই-ই।" এর প্রমাণ প্রফেসারের গল্প। "চার-ইয়ারী কথা"র মূল সুরটা এখানেও উপস্থিত আছে, প্রেমের অসংগতির ও হাস্যকর প্রমাদের দিকে লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আরও কয়েকটি ছোট গল্প আছে যেগুলি বীরবলীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, কিন্তু তাতে গল্পরস নিতান্তই কম। "অদৃষ্ট", "সম্পাদক ও বন্ধু", "ভাববার কথা" প্রভৃতি গল্পে কথার খেলাই বড় হয়ে উঠেছে। এগুলি পড়লে মনে হয় প্রমথ চৌধুরী তাঁর কয়েকটি প্রিয় তত্ত্বকে স্থাপনা করবার জন্য এগুলি রচনা করেছেন। "সহযাত্রী" ও "পূজোর বলি" —এ দু'টি বিশুদ্ধ গল্প, কোন তত্ত্ব নেই, আছে জীবনের বিচিত্র রহস্য।

"গল্প লেখা" প্রবন্ধটিতে গল্পলেখক ও তার বন্ধু—উভয়ের কথোপ-কথনের মধ্য দিয়ে প্রমথ চৌধুরী গল্পের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধের কয়েকটি মন্তব্য এখানে তুলে দিচ্ছি, এ থেকেই প্রমথ চৌধুরীর অভিমত বোঝা যাবে।

(ক) "জীবনের যত ট্রাজেডি তোমাদের গল্পলেখকদের হাতে পড়ে সবই কমিক হয়ে ওঠে। যে তা বোঝে না, সেই তা পড়ে কাঁদে; আর যে বোঝে, তার কান্না পায়।"

(খ) "যে ধাতু আর রঙ বদলে নিতে জানে,' তার হাতে ইংরেজী গল্প ঠিক বাংলা হবে।"

(গ) "এই জীবন জিনিসটিকে গল্পে পোরা যায় না—অন্তত ছোট-গল্পে ত নয়ই। জীবনের ছোট-বড় ঘটনা নিয়েই গল্প হয়।"

আবার "কথা-সাহিত্য" প্রবন্ধেও এই একই বিষয় নিয়ে চৌধুরী মহাশয় আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে গল্পের উপাদান ও উৎস নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে যে মন্তব্যগুলি তিনি করেছেন, তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধার করছি।

(ঘ) "গল্পের উপাদান হয় জীবনের বই, না হয় ত কাগজের বই থেকে আমদানি করতে হয়, এ-দুই ছাড়া এমন কোন তৃতীয় বই নেই, যার থেকে আমরা গল্পের মাল-মসলা সংগ্রহ করতে পারি।"

(ঙ) "জীবন-গ্রন্থ থেকে কথা-বস্তু সংগ্রহ করা এক হিসেবে অতি সহজ। কেননা, এ-গ্রন্থ সকলের সুমুখেই পড়ে' রয়েছে।···কিন্তু আর এক হিসেবে, এ-বই পড়া অতি কঠিন। আমাদের অধিকাংশ লোকের এ-পুস্তকের শুধু মলাটের সঙ্গে পরিচয় আছে।"

(চ) "আসল কথা, সাহিত্য-জগতে চুরি বলে কোনও জিনিস নেই। রামের কথা শ্যাম আত্মসাৎ করতে পারলেই, তা শ্যামের কথা হয়ে ওঠে। এই আত্মসাৎ ক্রিয়াটাই প্রতিভাসাপেক্ষ। যে পরের জিনিস নিজের মনের উত্তাপে গলিয়ে নিতে পারে না, সাহিত্য-রাজ্যে সে-ই চোরদায়ে ধরা পড়ে।"

(ছ) "আর এক কথা, কাগজের বই থেকে গল্পের উপাদান সংগ্রহ করা যদি চুরি হয়, তা হলে জীবনের বই থেকে তা সংগ্রহ করাও চুরি। সত্য কথা এই যে, মানুষের সুমুখে দুটি জগৎ পড়ে রয়েছে—তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রকৃতির হাতে গড়া, অপরটি মানুষের হাতে গড়া। এই উভয় জগৎ থেকেই মনের খোরাক সংগ্রহ করবার আমাদের সমান অধিকার আছে।"

(জ) "সেকালে ভারতবর্ষ যদি দেদার কথাবস্তু বিদেশে রপ্তানি করে থাকে ত একালে বিদেশ থেকে দেদার আমদানী করবার অধিকার আমাদের আছে। এ হচ্ছে আমাদের পিতৃঋণ পরকে দিয়ে শোধ করানো।"

উপরোক্ত মন্তব্যগুলির মোদ্দা কথা এই যে, প্রমথ চৌধুরী গল্পের রাজ্যে স্থান-কাল ভেদ মানতেন না, জাতের শুচিবায়ু তাঁর ছিল না, পরন্তু অচেনাকে আপন করে নেবার শক্তিকে উৎসাহ দিতে তিনি রাজি ছিলেন। গল্পকার প্রমথ চৌধুরী এবং প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী —এই দুজনে যে একই ব্যক্তি, একই মন, তার প্রমাণ উপরোক্ত মন্তব্যগুলি। প্রমথ চৌধুরী রোমান্টিক ন্যাকামিভরা গল্পের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন, তার প্রমাণ সদ্য-আলোচিত গল্পগুলি। তিনি যে জীবনগ্রন্থের এক অনুরক্ত পাঠক ছিলেন এবং সেই অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ যে আমাদের জীবনের যত হাস্যকর অসঙ্গতির বেলুনকে ব্যঙ্গের খোঁচায় চুপসে দেওয়া, তার প্রমাণ এই গল্পগুলি। পুনশ্চ, বিশুদ্ধ গল্পরসকে চৌধুরী মহাশয় কোনো কারণেই বলি দিতে রাজি ছিলেন না। সামাজিক, সাংসারিক, রাজনৈতিক—কোন আদর্শই তাঁর কাছে সাহিত্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠেনি।

প্রমথ চৌধুরী যে বিশুদ্ধ গল্পরসের একান্ত ভক্ত ছিলেন, তার প্রমাণ নীললোহিত ও তার কীর্তিকলাপ অবলম্বনে লিখিত গল্পগুলি। নীল-লোহিতের গল্পগুলি সংসারের চোখে গাজা। কিন্তু লেখক নীল-লোহিতকে অপদার্থ মনে করেননি। নীললোহিতকে সবাই বলত মিথ্যাবাদী, অথচ তাঁর গল্পে রস পেত। আর সে-সব গল্পের হিরো নীললোহিত স্বয়ং। তিনি করেন নি এমন কোন কাজ ভূ-ভারতে ছিল না, তিনি সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত রকমের বিপদে পড়েছেন ও প্রতিবারই উদ্ধার পেয়েছেন। নীললোহিত নানা স্বদেশী ডাকাতির গল্প বলতেন। বলাই বাহুল্য, সে-সবের নায়ক তিনিই। এই সব গল্প লোকমুখে ছড়িয়ে পড়াতে পুলিস নীললোহিতকে লাঞ্ছনা করে। ফলে তিনি গল্প বলা ছেড়ে দেন। গল্প বলা বন্ধ করে তিনি চাকরি নিলেন, সংসারী হলেন। লেখক বলছেন, "তিনি বাস করতেন কল্পনার জগতে। তাই নীললোহিত যা বলতেন—সে সবই হচ্ছে কল্পলোকের সত্য কথা। তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ সবই ছিল ঐ কল্পনার রাজ্যে অবাধে বিচরণ করায়। সুতরাং সেই কল্পলোক থেকে টেনে তাঁকে যখন মাটির পৃথিবীতে নামান হল, তখন যে তাঁর শুধু প্রতিভা নষ্ট হল, তাই নয়, তাঁর জীবনও মাটি হল।—দিনের পর দিন তাঁর অবনতি হতে লাগল।"

সংসারী কেরানী নীললোহিতকে দেখে দুঃখ করে চৌধুরী মহাশয় বলেছেন, "লোকে বলে যে, তিনি সত্যবাদী হয়েছেন—কিন্তু আমার মতে তিনি মিথ্যার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন। তাঁর স্বধর্ম হারিয়ে, যে জীবন তাঁর আত্মজীবন নয়, অতএব তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা জীবন—সেই জীবনে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা এই ভেবেই খুশী যে, তিনি এতদিনে মানুষ হয়েছেন, কিন্তু ঘটনা কী হয়েছে জানেন? নীললোহিতের ভিতরে যে মানুষ ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে, যা টিকে রয়েছে, তা হচ্ছে সংসারের ঘানি ঘোরাবার একটা রক্তমাংসের যন্ত্রমাত্র।"

নীললোহিতের কীর্তিকলাপ নিয়ে প্রমথ চৌধুরী যে কটি গল্প লিখেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ অ্যাডভেঞ্চার-গল্প। বিশুদ্ধ গল্পরস ও অ্যাডভেঞ্চার-রস একত্র পাওয়া যায় নীললোহিতের গল্পে।

গল্পকার প্রমথ চৌধুরীর প্রধান বক্তব্য কি? স্বধর্মভ্রষ্ট হয়ো না, নিজ ধর্মে আস্থা রাখ, অবাস্তব রোমান্টিক প্রেমের মায়ায় না ভুলে বাস্তবকে নিজের কল্পনাতে মেনে নাও। আর যদি তা না পার, তবে নীললোহিতের মত অপমৃত্যু ঘটবে।

বীরবলী সনেট

স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য, বক্রকটাক্ষসমন্বিত জীবনদৃষ্টি, পরিহাসপ্রিয়তা ও অসাধারণ রসবোধ নিয়ে প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বীরবল বাংলা-প্রবন্ধ কবিতার চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন, সবুজপত্রের মাধ্যমে সেদিনের নবীন সাহিত্যধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় লেখায় ক্ষান্তি দেন। স্থূলবিচারে বলা যায়, ১৯১০ থেকে ১৯৪০ঃ এই ত্রিশ বৎসরের কালসীমার মধ্যে তাঁর সাহিত্যজীবন বিধৃত। এর মধ্যে কাব্যজীবন অতি সংক্ষিপ্ত। "সনেট-পঞ্চাশৎ" (১৯১৩) ও "পদ-চারণ" (১৯১৯)ঃ মাত্র দুটি কাব্যগ্রন্থে তাঁর কাব্যচর্চার ফসল সংগৃহীত হয়েছে। এই দুটি কাব্যের রচনাকাল (১৯১১-১৯১৬) তাঁর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে। তখন তিনি মধ্যযৌবনে পৌঁছেছেন। প্রথম যৌবনের মদবিহ্বলতা, উল্লাস ও উচ্ছ্বাস তখন অনুপস্থিত! প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য, বিষণ্ণতা ও স্থৈর্যের স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর কবিতায়। তাই এগুলিকে বীরবলের দ্বিতীয় যৌবনের কবিতা আখ্যা দেওয়া যায়। বীরবলের কবিতার আন্তরধর্মবিচার পরে করছি। সনেট, পয়ার, ত্রিপদী, ছড়া এবং তেরজা—রিমা ও ট্রায়োলেটঃ এই দুটি সংকলনে বিধৃত হয়েছে; সনেট এর মধ্যে বেশি এবং সনেট রূপকর্মের মাধ্যমেই বীরবলের কবিপ্রতিভা প্রকাশিত। সনেটের গূঢ় নির্মাণকৌশল ও চরিত্ররহস্য বীরবল আয়ত্ত করেছিলেন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং তার বিস্তৃত পরিচয়ে প্রমথ-প্রতিভার স্বরূপ নিহিত, এই বিশ্বাসে বর্তমান প্রবন্ধের সূচনা।

সনেট-রচনা সম্পর্কে বীরবল নিজেই নানা মন্তব্য করে গেছেন নানা ক্ষেত্রে; সেগুলি সযত্নে অনুধাবন করলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রমথ চৌধুরী তৎকালিক বাংলা কাব্য-ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি যদিও বারবার বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন, তথাপি বীরবলী সনেট পাঠে মনে হয় তা কেবল রবীন্দ্রনাথের

প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন মাত্র। রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল না, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তৎকালে প্রচলিত রোমান্টিক প্রেমের ন্যাকামিকে তীব্র ব্যঙ্গ করে তিনি যে 'সনেট-সপ্তক' (পদ-চারণ) লিখেছেন, তার ভূমিকাটি এক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ যে কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রকাব্যাদর্শের প্রবল অভিভবে আত্মসমর্পণ করে গ্রামীণ প্রকৃতিতে রোমান্টিক কল্পনার আশ্রয়সন্ধানে ফিরছিলেন; তাঁদের সঙ্গেও প্রমথ চৌধুরীর কোনো আন্তর যোগ ছিল না। আর কল্লোল-গোষ্ঠীর কবিরা যখন নোতুন জীবনাদর্শের প্রচারে কাব্যসাধনাকে উৎসর্গ করেছিলেন, তখন প্রমথ চৌধুরী কাব্যজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই একথা বলা যায়, প্রমথ চৌধুরী বাংলা কাব্যজগতে নিঃসঙ্গ পথিক এবং তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। যদি কিছু সাদৃশ্য আবিষ্কার করতে হয়, তবে আমাদের যেতে হবে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যাদর্শের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর কাব্যাদর্শের খানিকটা মিল পাই বস্তুচেতনায়, প্রখর বাস্তবজ্ঞানে ও সূক্ষ্ম ছায়াময় রোমান্টিক ভাবকল্পনার বিরোধিতায়। এ প্রসঙ্গে বীরবলের 'দ্বিজেন্দ্রলাল' সনেট স্মর্তব্য। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কারণে "সোনার তরী" ও রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছিলেন, তাতে প্রমথ চৌধুরীর কিছুমাত্র সমর্থন ছিল না। কল্পনার রাশ আলগা করে দিয়ে উধাও হয়ে যেতে উভয়েরই আপত্তি ছিল। তার প্রমাণস্বরূপ দুটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি।

দ্বিজেন্দ্রলাল 'আলেখ্য' কাব্যের (১৯০৭) ভূমিকায় লেখেন: "এ পদ্যগুলি কবিতা হোক বা না হোক—প্রহেলিকা নয়। এ গ্রন্থের কোন কবিতা পড়ে' তার মানে দশজন দশরকম বের করে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না।"

বীরবল 'পদ-চারণ' কাব্যের (১৯১৯) উৎসর্গপত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখেন: "গদ্যের কলমে-লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক, আছে—rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ—reason। এর প্রথমটি যে পদ্যের এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গুণ এ সত্য আপনার কাছে অবিদিত নেই, সুতরাং আশা করি, আমার এ রচনা আপনার কাছে অনাদৃত হবে না।"

যুক্তি ও বাস্তবের কঠিন ভূমিতেই প্রমথ-কবিতালক্ষ্মী বিচরণ করেছেন এবং কল্পনার টানে তিনি শূন্যবিহারী হয়ে যান নি এবং মন তা হতে চাইলেও তাকে বস্তুচেতনা পরিত্যাগ করতে দেন নি, এসত্য প্রমথ-কাব্যপাঠকের অবিদিত থাকা উচিত নয়। তাঁর কালে, 'বিশে'র দশকে রবীন্দ্রানুসারিতার নামে যে রোমান্টিক জলো কল্পনাসর্বস্বতা ও ভাবোচ্ছ্বাস প্রাধান্য লাভ করেছিল, তার বিরুদ্ধে সুচতুর প্রতিবাদ বিধৃত হয়েছে 'সনেট-পঞ্চাশৎ' কাব্যের শেষ সনেটে। এই 'আত্মকথা' সনেটে বীরবলের কাব্যদর্শন স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে :

> কবিতা আমার জানি, যেমন শঙ্কুর,
> দু'দিনে সবাই যাবে বেবাক্ ভুলিয়ে !
> কল্পনা রাখিনে আমি আকাশে তুলিয়ে,—
> নহি কবি ধূমপায়ী, নলে ত্রিবঙ্কুর ॥
> হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অঙ্কুর,
> ওঠে না তাহার ফুল শূন্যেতে দুলিয়ে।
> প্রিয়া মোর নারী শুধু, থাকে না ঝুলিয়ে,
> স্বর্গ-মর্ত্ত্য-মাঝখানে, মত ত্রিশঙ্কুর !
> নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন,
> আমার হৃদয় যাচে বাহুর বন্ধন ॥
> কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল,
> মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
> তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,—
> মনোঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়িনে লাটাই !

অশরীরী ভাবকল্পনায় অনুৎসাহ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের বস্তুজগতের প্র অনুরাগ প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় অবশ্যলক্ষণীয়।

প্রমথ চৌধুরী কাব্যচর্চা করেছেন মধ্য যৌবনে পৌছে এবং তার স্থায়িত্বকাল মাত্র ছয় বৎসর—১৯১১ থেকে ১৯১৬। এর কারণ কি? বোধ করি, তাঁর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সমকালে কবিতারাজ্যে আর কাউকে জয়পতাকা প্রোথিত করতে হবে না। শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেছেন, "ইংরাজীতে যাকে বলে exuberance, সে জিনিষ যে প্রতিভার ধর্ম তা রবিবাবুর রচিত সাহিত্য

থেকেই প্রমাণ হয়। আমাদের আর পাঁচজনের যে নাম করেছ তাদের কারও নাম রবিবাবুর নামের পাশে উল্লেখ করা যেতে পারে না। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যা সম্ভব তা আমরা করেছি, হয়ত পরেও করব। কিন্তু আমাদের মনের মাপ আমরা জানি, অন্ততঃ আমি ত জানিই। তবে আমি রবীন্দ্রনাথ নই বলে যে আমার পক্ষে মৌনব্রত অবলম্বন করা কর্তব্য, এমন কথা আমি কখনো মনে স্থান দিই নি। আমার বিশ্বাস আমরা যে যা পারি সেইটুকুই ভাল করে করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।" (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪)। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হযে তিনি চলে গেলেন গদ্যরাজ্যে। সেখানে যুক্তি ও সত্যাদিদৃক্ষা, সন্দেহ ও সংশয়, পরিহাস ও ব্যঙ্গ তাঁর পাথেয়।

"কৈফিয়ৎ", "কবিতা লেখা", "প্রেমের খেয়াল", "পত্র" প্রভৃতি কবিতায় বীরবল কাব্যচর্চায় তাঁর আসক্তি ও নিবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। আর "গজল", "সনেট", "ব্যর্থ জীবন", "হাসি ও কান্না", "উপদেশ", "বন্ধুর প্রতি" ও "আত্মকথা" প্রভৃতি কবিতায় কবিমানসের আন্তর পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিচয় গ্রহণের আগে সনেটের গূঢ় নির্মাণকৌশল আয়ত্ত করতে প্রমথ চৌধুরী যে-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, সে প্রসঙ্গে আসা যাক্।

॥ ২ ॥

বিশুদ্ধ ক্লাসিকাল সনেট বলতে ইতালীয় সনেটকেই বোঝায়। তার শ্রেষ্ঠ শিল্পী পেত্রার্কা। ফরাসি সনেটে ও ইংরেজি সনেটে ইতালীয় সনেটের বিশুদ্ধি ও সংহতি অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয় নি। বাংলা সনেটের আলোচনা করলে দেখা যায়, ইতালীয়, ফরাসী ও ইংরেজী, এই তিন দেশীয় সনেটের প্রভাবই রয়েছে। সনেটের জন্মভূমি ইতালিতে বহু পরীক্ষার পর সনেটের মূল রহস্য—সনেটের মধ্যবর্তী ভাবের আবর্তন-লীলা আবিষ্কৃত হয় এবং পেত্রার্কার হাতেই তার পূর্ণবিকাশ ঘটে। সনেটের সার্থকতা ঐ মধ্যবর্তী আবর্তন-সন্ধিতেই নিহিত। সনেটে অষ্টক-বন্ধের শেষে এবং ষট্‌ক-বন্ধের প্রারম্ভে ভাবের আবর্তনসন্ধি।

ছন্দঃস্পন্দ ও ভাববন্ধের এই আবর্তনের সম্যক্ সঙ্গতিতেই ইতালীয় সনেটের সার্থকতা।

সনেটের এই দুরূহ মানদণ্ডে যদি বাংলা সনেটকে বিচার করা যায়, তবে দেখা যায় একমাত্র মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই ইতালীয় সনেটের কঠিন আদর্শ অটুট আছে। রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে পেত্রার্কার ইতালীয় সনেটের উপরোক্ত আদর্শের অনুসরণ করেছিলেন 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে, কিন্তু সেখানেই তিনি ঐ আদর্শচ্যুত হয়েছিলেন। ফরাসী ও ইংরেজী সনেটের অনুসৃতিও এতে লক্ষ্য করা যায়। রঁদেল ও রঁদোর স্তবক-বিন্যাস, শাঁ র‍্যায়াল ও শেকস্‌পীয়রীয় মিল-বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের সনেটে দেখা যায়।

প্রমথ চৌধুরী পেত্রার্কীয় সনেটের কঠিন আদর্শকে রক্ষা করেননি। যদিও তিনি 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর প্রথম সনেটে বলেছেন, "পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ", তথাপি বীরবলী সনেটে অনুসৃতিই সমধিক লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বহু সনেটেই পেত্রার্কার অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ রক্ষিত হয় নি। ভাবের আবর্তন-সন্ধি-মতবাদে তাঁর বিশেষ প্রীতি নেই, ষট্‌কের প্রথম দু চরণে—নবম দশম চরণে—ভাবকে গুটিয়ে নিয়ে শেষ চার চরণে নোতুন করে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ফরাসী সনেটের একটি বিশেষ প্রকার ভেদে অষ্টক-বন্ধের পরে ষট্‌কবন্ধ শুরু হয় নবম দশম চরণের অন্ত্যমিলে। মিত্রাক্ষর ষট্‌কবন্ধ শুরু করার এই রীতি Renand, Ronsard প্রমুখ ফরাসী সনেটকার প্রবর্তন করেন। প্রথম চৌধুরী এই রীতিরই অনুসরণ করেছেন। এই রীতি-অনুসৃতি এর আগে পাই রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'চরণ', 'হাসি' সনেটে। 'দেশ' পত্রিকার ১৩৬৩ সালের সাহিত্য-সংখ্যায় প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরী-লিখিত কয়েকটি পত্রে 'ফরাসী সনেটের ছাঁচ অবলম্বন' করার স্বীকৃতি আছে। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর প্রতিটি সনেটই ফরাসী রীতিতে রচিত। প্রথমে দুটি চৌপদী, তারপর একটি দ্বিপদী, তারপর আর-একটি চৌপদী। 'পদ-চারণ-'এর কয়েকটি সনেট ইতালীয় সনেটের কমিটি আদর্শে রচিত অর্থাৎ অষ্টক ও ষট্‌ক—দুটি স্পষ্ট ভাগে তা বিভক্ত, ও অষ্টকের সমাপ্তি ও ষট্‌কের সূচনায় ভাব ও ছন্দের

আবর্তন (Volte,) ও এই আবর্তন-সন্ধিতে ভাবের ভারসাম্যরক্ষার কঠিন আদর্শ অনুসৃত হয়েছে।

পেত্রার্কার আদর্শ সনেট-রীতিতে অষ্টকে সংবৃত বা বিবৃত চতুষ্ক-যুগল রচনা করা হয় ও ষট্‌কে ত্রিক-যুগল বিবৃত এবং মিত্রাক্ষর-যুগ্মকে সনেটের সমাপ্তি সেখানে অনভিপ্রেত: প্রমথ চৌধুরী এই কঠিন আদর্শ থেকে বারবার বিচ্যুত হয়েছেন এবং তার জন্য তিনি লজ্জিত নন্। তিনি বলেছেন, "ইতালীয় ধরণের সনেট লেখা আরও কঠিন। মধ্যে হাঁফ ফিরবার অবসর পাওয়া যায় না।" (দ্র. দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৩। পৃ. ২৪)। তাই কেবল ফরাসী সনেটের মুক্তি তাঁর কাছে যথেষ্ট মনে হয় নি, শেক্‌সপীয়রীয় সনেট-রীতিও মাঝে মাঝে অনুসরণ করেছেন। ইতালীয় সনেটে অন্তিম মিত্রাক্ষর-যুগ্মক বা অন্ত্যমিলযুক্ত পয়ার নিন্দিত, কিন্তু শেক্‌সপীয়রীয় সনেটে তার বহুল-অনুসৃতি। 'চোরকবি', 'তাজমহল', 'ভুল' ও 'তত্ত্বদর্শীর সিন্ধুদর্শন' সনেট তার উদাহরণ। 'পত্রলেখা' সনেটের ভাবতরঙ্গ ত্রিধাবিভক্ত। অষ্টকে ভাবের বিরাম, ষট্‌কে প্রথম যুগ্মকে (নবম দশম চরণে) প্রবর্তিত ভাবের দশম চরণেই পূর্ণতাপ্রাপ্তি, পুনর্বার শেষ চতুষ্কে ভাবের নোতুন আবর্তন। সনেট-কলাকৃতি-বিচারে এই সনেটটি দোষদুষ্ট, প্রিয়নাথ সেনের এই অভিযোগের (দ্র. 'সনেট-পঞ্চাশৎ' প্রবন্ধ) উত্তরে প্রমথ চৌধুরী এক পত্রে বলেছেন, "এতে যে কোনরূপ রসভঙ্গ হয়েছে এমন বিশ্বাস আমার নয়। বংশীধারীর পক্ষে ত্রিভঙ্গরূপ ধারণ করাটা অন্ততঃ এদেশে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।" (দ্র. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৩)।

এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পেত্রার্কীয় সনেটের কঠিন আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষায় তাঁর আস্থা ছিল না। তাঁর ফরাসী সাহিত্য তথা ফরাসী সনেট-প্রীতি তাঁকে বরং বিপরীত পথেই চালিত করেছিল। তাই বীরবল যখন নিজে লেখেন,

> ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
> শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপর ক্রন্দন।

তখন মনে হয় এ-কথা তিনি অন্তরের সঙ্গে লেখেন নি: অবশ্য প্রতিভার লক্ষণই এই যে, তা কোনো নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ নয়। তথাপি একথা স্মর্তব্য যে, নিয়মের কাঠিন্য নিপুণ শিল্পীর পক্ষে বন্ধন

বা বিঘ্ন নয়, প্রতিভার বিকাশে তা সহায়ক, যেমন মধুসূদনের ক্ষেত্রে। তবে প্রমথ চৌধুরী কেন পেত্রার্কার চরণবন্দনা করেছেন যদিও তাঁর পদানুসরণ করেন নি? এর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন, পেত্রার্কা ও সনেটঃ এ দুটি পরস্পর আপেক্ষিক শব্দ বলেই তা তিনি করেছেন, (দ্র. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত পত্র, 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৬৩, পৃ. ২৩)।

সনেট রচনায় কেন তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার উত্তর তিনি দিয়েছিলেন শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে জীবনের শেষভাগে লিখিত দুটি পত্রে (দ্র. দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৩)। এ দুটি পত্রে তিনটি কারণ বীরবল দেখিয়েছেন। প্রথমত, সমকালীন কাব্যে চিন্তায় শৈথিল্যের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা, রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পাঠে বিরক্তি, ভাস্কর্যধর্মী সনেটের প্রাণ তার আঙ্গিকের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তার চর্চায় ইমোশনের রাশ টেনে ধরার ও সদাজাগ্রত থাকার সুযোগলাভ।

এ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য। বীরবল বলেছেন, "আমার সনেট যদি কবিতা হয়, তাহলে সে কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী।······art অনেকটা বন্ধনের সামগ্রী। আমি যে সনেট লিখেছি সে অনেকটা experiment হিসাবে। যদি তা সত্ত্বেও আমার কতকগুলি সনেট [illegible]তরে থাকে তা এই সনেটের বাঁধাবাঁধি নিয়মের গুণে। আমার সনেটের অন্তরে হয়ত art-এর চাইতে artificiality বেশী।" (শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে ৬,১১.৪১ তারিখে লিখিত পত্র)।

বীরবলী সনেটের কলাকৃতি ও আঙ্গিকের প্রসঙ্গ আলোচনা শেষে এবার কাব্যবিচারের শেষ পর্যায়ে আমরা উপনীত হ[illegible]। বীরবলী সনেটে আর্ট বেশী, না, আর্টিফিশিয়ালিটি বেশী; এ কি শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা না, তদপেক্ষা বেশি-কিছু। এই প্রশ্নের মীমাংসায় এই দুই কাব্যগ্রন্থের মূল্য নির্ভরশীল।

॥ ৩ ॥

'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর প্রথম সনেটে বীরবল স্পষ্টভাষায় বলেছেন

> বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার,
> তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার,

একথা পণ্ডিতে বুঝে মূর্খে লাগে ধন্ধ।

প্রমথ চৌধুরীর কবিমানসে কাব্যবাণী সাকার হয়েছিল, তা মনোযোগী পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন।

রবীন্দ্রকাব্যের খেলো নকল পড়ে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন, তাই সমকালীন রোমান্টিক ভাবাতিরেক ও উচ্ছ্বাসের প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন 'উপদেশ' সনেটে :

প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালবাসা,
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন!
তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন,
জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষা!
বড় কবি কিম্বা হতে যদি তব আশা,
ভাবুক বলিবে তোমা জন-সাধারণ,
শেখো যদি সমাজের, করি প্রাণপণ,—
দরকারি ভাব, আর সরকারী ভাষা!
যত যাবে মাটি আর খাঁটিকে ছাড়িয়ে,
শূন্যে শূন্যে মূল্য তব যাইবে বাড়িয়ে॥

বীরবলের কাব্যাদর্শ এর থেকে অনুমান করা যায়। 'দরকারি ভাব আর সরকারী ভাষা'র প্রতি তাঁর ছিল একান্ত অনীহা, 'জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষা' নিয়ে কবিতা-রচনার ব্যর্থ প্রয়াসে তাঁর আগ্রহ ছিল না এবং সত্য ও বস্তুকে ত্যাগ করে অবাস্তব রোমান্টিক কল্পনার ফানুষ ওড়াতে তিনি ব্যগ্র হয়নি। স্পর্ধিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট প্রবন্ধকার বীরবল এখানে উপস্থিত। জনপ্রিয়তা বা পাঠক-অভিনন্দনের জন্য তাঁর কিছুমাত্র লোলুপতা ছিল না, তাই স্পষ্টভাষায় বলেছেন 'পাঠকের মুখ চেয়ে লিখি নি কেতাব' ('ব্যর্থজীবন' সনেট)। একথা এক শ বার সত্য, এখানেই কবি প্রমথ চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্য।

চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়ে বীরবল কবিতা রচনা শুরু করেন এবং ছ' বৎসরের (১৯১১-১৬) মধ্যেই তার সমাপ্তি। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছে তাঁর এই কাব্যচর্চায়, আগেই বলেছি, দ্বিতীয় যৌবনের বন্দনা গীত হয়েছে। 'চার-ইয়ারি কথা' (১৯১৬) এবং 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) ও 'পদচারণ' (১৯১৯): একই সময়ে লেখা। তিনটি গ্রন্থে দ্বিতীয় যৌবনে

পদার্পণ করে প্রথম যৌবনের swan-song গাওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কবি প্রমথ চৌধুরী যৌবনের ও প্রেমের কবি ছিলেন, এবিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নেই। আপাত-ব্যঙ্গ, তির্যক-কটাক্ষ-সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গীর (bantering attitude) পেছনে একটি যৌবনরাগে সমুজ্জ্বল প্রেমমুগ্ধ তরুণ কবিমন বর্তমান, এই তিনটি গ্রন্থপাঠে একথাই আমার মনে হয়েছে। 'চার-ইয়ারি কথা'র অপূর্ব প্রেম-পরিবেশ বর্ণনার সঙ্গে এই দুটি কাব্যের কয়েকটি সনেটের মিল আবিষ্কার করা কঠিন নয়। 'চার-ইয়ারি কথা'য় রোমান্টিক প্রেমকে বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করতে গেলে কি রকম নাকাল হতে হয়, তার সরস বর্ণনা আছে এবং তৎকালীন বাংলা রোমান্টিক প্রেমকাহিনীর তীব্র ব্যঙ্গ এই গল্পগ্রন্থটি, তা সবাই জানেন। আলোচ্য তিনটি গ্রন্থেই রোমান্টিক প্রেমসাধনার ন্যাকামি, অতিরেক ও উচ্ছ্বাসকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। প্রিয় বস্তুর বিকৃতি বা ন্যাকামি দেখলেই লোকে তাকে ব্যঙ্গ-উপহাস করে, মূল বস্তুকে করে না, এ সত্য যদি স্মরণে রাখি, তবে আমাদের স্বীকার করতে বাধা ঘটে না যে, প্রমথ চৌধুরী মূলত যৌবনের উপাসক-কবি ছিলেন। আর সেজন্যই তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যে ও জীবনে প্রচলিত কিশোরীভজনার তীব্র নিন্দা করেছেন 'বালিকা-বধূ' সনেটে :

বাঙ্গলার যত নব যুবা কবিবঁধু,
যুবতী ছাড়িয়া এবে ভজিছে বালিকা।
তাদের চাপিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়-নালিকা,
চোঁয়াতে প্রকাশ পায় তাজা প্রেম-মধু।
বলিহারি কবি-ভর্ত্তা এম.এ. আর বি.এ.
বাল-বধূ লতিকার ঝুলিবার তরু!
মানুষ মরুক সবে গলে রজ্জু দিয়ে,
বেঁচে থাক্ কবিতার যত কাম-গরু!

যৌবন ও প্রেমের বন্দনা এ দুটি কাব্যগ্রন্থে ইতস্তত ছড়ানো আছে। তেরজা রিমা ছন্দে রচিত দীর্ঘ 'কৈফিয়ৎ' কবিতাটিকে মনের বাসনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন বীরবল,

যৌবনে বাসনা ছিল, দুনিয়ার ছবি,
আঁকিতে উজ্জ্বল করে সাহিত্যের পত্রে।

কিন্তু হায়! সংসারের শাসনে তা পূর্ণ হবার অবকাশ ঘটল না। আত্মার আলো হারিয়ে, প্রাণের আনন্দভ্রষ্ট হয়ে কবি যৌবনপ্রান্তে পৌঁছে অনুভব করলেন 'হইল মনের দফা প্রায় নিকেশ'। তাই কবি তখন,

হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান,
সভয়ে চলিনু ফিরে বাণীর ভবনে,
যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান।
আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ,
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে।

স্বল্পকালস্থায়ী দ্বিতীয় যৌবনের কাব্যফসল 'সনেট-পঞ্চাশৎ' ও 'পদ-চারণ'-এ সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু সময় সংক্ষেপ, জীবনের যাত্রা প্রায়-সমাপ্ত, তাই তিনি ধ্রুপদ-ধামার ছেড়ে চুটকি-গজলে যত আশা-ভালবাসা উপস্থিত করেছেন ('গজল' সনেট) এবং সনেটের ক্ষুদ্রকায়ে বাণীকে বন্দনা করেছেন। ছোটখাট তান রচনার জন্য কবি এখন,

আনিনু সংগ্রহ করি বিঘৎ প্রমাণ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্ণেট,
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ।
ইহাতে মূরতি ধরে আজি যে সনেট,
কবিতা না হতে পারে কিন্তু পাকা পদ্য,
প্রকৃতি যাহার 'জেঠ', আকৃতি 'কনেঠ'।
অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরোপুরি চোদ্দ।

প্রমথ-মানসিকতার সঙ্গে সনেট-প্রকৃতির অন্তরঙ্গ মিল ঘটেছিল বলেই সনেট প্রমথ-প্রতিভার কাব্য-বাহন হয়েছিল। তাই বারবারই তিনি সনেট-সুন্দরীর রূপবর্ণনা করেছেন। 'পদ-চারণ'-এর 'সনেট-সুন্দরী', 'সনেট'; "সনেট-পঞ্চাশৎ"-এর 'সনেট' তার পরিচায়ক। বনেট-পরা সনেট-সুন্দরীর যৌবন-বর্ণনা পাই 'সনেট-সুন্দরী'তে:

বিগাঢ় যৌবনা তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আঁট সাঁট ক্ষুদ্র।

শিশির-ঋতুর স্নিগ্ধ মসৃণ রউদ্র
ঘনীভূত করে' গড়া স্বর্ণ-পাঞ্চালিকা।
দৃঢ়বন্ধে সুসংযত করে কঞ্চুলিকা
পরিপূর্ণ হৃদয়ের অশান্ত সমুদ্র,
কলার শাসনে শান্ত মন তার রুদ্র,
মন্ত্রদেহ ষোড়শীর ধরেছে কালিকা।
সন্তর্পণে করি তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ,
ভয় হয় অনিপুণ অঙ্গুলি-পরশে
ছিন্নভিন্ন হয়ে তার কাঁচুলির ডোর,
ব্যক্ত হয়ে পড়ে বুকে সংরুদ্ধ আক্ষেপ!
নির্গ্রন্থ হৃদয়মুক্ত উদ্বেলিত রসে,
সে রূপ মলিন করে নয়নের লোর।

দ্বিতীয় যৌবনের কবি বোধ করি বিগাঢ়যৌবনা তন্বী সনেট-সুন্দরীর কাছেই শান্তির আশ্রয় পেয়েছিলেন।

একদিন যে যৌবনের মদালসে মহোৎসব আনন্দে উচ্ছ্বাসে কবি-জীবন ভরে উঠেছিল, তার কিছু সুখস্মৃতি এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে।—প্রেমের রসের যৌবনের আনন্দ-উপলব্ধি তাঁর জীবনে ঘটেছিল এবং 'কৈফিয়ৎ' কবিতায় উল্লিখিত সাংসারিক অকৃতকার্যতায় সান্ত্বনা দিয়েছিল, তার প্রমাণ পাই, 'প্রেম খেয়াল', 'পূর্ণিমার খেয়াল', 'ভাল তোমা বাসি যখন বলি', 'পত্র' কবিতায় ও 'ভুল', 'ফসলে গুলমে ময়সে তৌবা?', 'বন্ধুর প্রতি', 'একদিন', 'সুরা', 'রোগ শয্যা', 'গজল', 'স্মৃতি', 'রূপক' 'স্বপ্নলঙ্কা' ও 'প্রতিমা' সনেটে।

অলসমধুর যৌবনস্মৃতিচারণায় কবি বলেছেন,

আজি সে ফুলের গন্ধ রয়েছে সঞ্চিত
অস্পষ্ট স্মৃতির মত, সব মন ছেয়ে।
দেবতার স্থিরনেত্রে, পূর্বপরিচিত,
রত্নদীপ-শিখা সম, দূরে আছে চেয়ে! (স্মৃতি)

অতিক্রান্ত যৌবনের প্রেমের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন,

নিভানো আগুন জানি জ্বলিবে না আর,

মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার,—
হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত হার।
হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার! ('ভুল')

'একদিন', 'সুরা', 'বন্ধুর প্রতি', 'প্রিয়া' সনেট ও 'প্রেমের খেয়াল', 'ভাল তোমা বাসি যখন বলি' কবিতায় সেই প্রেম ও যৌবনলীলার ঈষৎ পরিচয় রয়েছে। দ্বিতীয় যৌবনের বিষণ্ণ অপরাহ্নে কবি প্রথম যৌবনের সেই প্রতপ্ত মধ্যাহ্নের দিনগুলি-স্মরণে এই কবিতাগুলি রচনা করেছেন; এদের মধ্য থেকে যৌবনোপাসক প্রেমিক কবিমানসটিকে চিনে নিতে আমাদের ভুল হয় না।

॥ ৪ ॥

জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হয়েও কবি জীবনবিমুখী নন। বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, তাঁর জন্য নয়; দুঃখের গান গাইতে তিনি রাজী নন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে নিয়ে যে সনেট বীরবল লিখেছিলেন, সে বর্ণনা তাঁর সম্পর্কেও প্রযোজ্য: 'উদার-আঁধার মাঝে বিদ্যুতের মত উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র তীব্র হাসি'। দুঃখবিরোধিতা ও জীবনাসক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে 'হাসি ও কান্না' সনেটটিতে। এখানে প্রমথ-কবিমানসের একটি পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য:

সত্য কথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি
দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল,
কথায় কথায় যাহে ভরে আসে জল,—
আমি খুঁজি চোখে চোখে আনন্দের হাসি॥
আর আমি ভালবাসি বিদ্রূপের হাসি,
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মম অনল
দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাজি॥
হৃদয়ে কৃপণ হয়ে ধনী হতে চায়
সুখ তারা দেয় নাকো, তাই দুঃখ পায়॥
তাই আমি নাহি করি দুঃখেতে মমতা,

সুখী যারা, তারা মোর মনের মানুষ।
হাসিতে উড়ায় তারা নিষ্ঠুর ক্ষমতা,
মনে জেনে বিশ্ব শুধু রঙীন ফানুষ॥

'জীবনের প্রতি ব্যর্থ পল স্মৃতিতে একত্র' করে অতীত কুড়িয়ে চলার পথে হাসিই পাথেয়, তা কবি বিশ্বাস করেন ('হাসি' সনেট)। 'ধরণী' সনেটে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয় বৈরাগ্যের প্রতিবাদ ঃ

কে বলে পৃথিবী এবে হয়েছে প্রাচীন?
আজিও বসন্তে এসে কোকিল পাপিয়া
মুক্তকণ্ঠে তারস্বরে ডাকে 'পিয়া' 'পিয়া'।

বার্ধক্যের স্বপ্ন ভেঙে যৌবনের উপাসনায় কবি আত্মনিয়োগ করেন। দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়—

আজিও প্রকৃতি আছে সবুজ সৌখীন।
নরনারী আজো ধরে পরস্পর বক্ষে—
অমানুষ পরে শুধু ডোর ও কৌপীন!

'ব্যর্থজীবন' সনেটে কবির নির্ভয় ঘোষণা ঃ 'তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে।' এই জীবনানুরাগ কবিকে প্রৌঢ় সায়াহ্নের ব্যর্থতা ও হতাশা থেকে রক্ষা করেছে।

এই জীবনানুরাগেরই আরেক প্রকাশ ঘটেছে ফুল ও প্রকৃতি-বিষয়ক সনেটগুচ্ছে। বর্ণভাণ্ডের সমস্ত রঙ উজাড় করে দিয়ে কবি চিত্র অংকন করেছেন। 'চোরকবি' সনেটে এই বর্ণালিম্পনের নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। অবিদ্যাসুন্দরীর কি অসাধারণ বর্ণনা!

কনকচম্পকদামে সর্বাঙ্গ আবরি
সুপ্তোত্থিতা শিথিলাঙ্গী বিলোলকবরী,
প্রমাদের রাশিসম অবিদ্যা-সুন্দরী।

'অপরাহ্ন' সনেটে যৌবনের স্বর্ণপুরীতে গোলাপ শব্দটির পুনরুক্তি পাঠক-মনকে জাগ্রত করে তোলে ঃ

গোলাপ, গোলাপ, শুধু গোলাপের রাশি!
গোলাপের রঙ ছিল অনন্ত আকাশে,
গোলাপের গন্ধ ছিল ধরাতে বাতাসে,
নারীর অধরে ছিল গোলাপের হাসি।

সঙ্গীতরাগিণী ও ফুল-বিষয়ক সনেটগুলিতে কবির পঞ্চেন্দ্রিয় উপাসনার সার্থক পরিচয় বিধৃত হয়েছে। 'কাঁঠালী চাঁপা', 'করবী', 'কাঠ-মল্লিকা', 'রজনীগন্ধা', 'গোলাপ', 'ধুতুরার ফুল', 'বাহার', 'পূরবী', 'গজল' (সনেট পঞ্চাশৎ), 'বনফুল', 'চেরিপুষ্প' সনেটনিচয়ে এই পরিচয় বর্ণালিম্পনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই সনেটগুলির শব্দ-চয়নে ও ভাব-রূপায়নে যে স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য ও প্রচলিতকাব্যরীতিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়, তা-ই এদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এগুলি শিল্পকর্ম ত্রুটিহীন, বর্ণালিম্পন নিপুণ ও ভাব অতিশয় মৌলিক। প্রতিনিধি-রূপে 'কাঁঠালী চাঁপা' সনেটটির বিশেষ উল্লেখ করা যায়। বাচন-ভঙ্গিতে ও উপস্থাপনে এমন একটি মৌলিকতা আছে যে তা পাঠকের প্রচলিত সাহিত্যবিশ্বাসকে স্পর্ধাভরে উপেক্ষা করে এবং পাঠককে তা মেনে নিতে বাধ্য করে। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'চম্পক' ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চম্পা'র সঙ্গে প্রতিতুলনায় 'কাঁঠালী চাঁপা'-র স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় কেবল ইন্দ্রিয়োপভোগ, বর্ণের সমারোহ; সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় সূর্যলাবণ্যময়ী বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে জাত চম্পাসুন্দরীর বর্ণনা, আর বীরবলের সনেটে আবেগরহিত কাটা কাটা বাক্যে কাঁঠালী চাঁপার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। কাঁঠালী চাঁপার বর্ণনায় কবি প্রথানুগত্যের বিরোধিতা করেছেন; তাঁর মন্তব্য পাঠকমনকে এক খোঁচায় সচেতন করে তোলে যখন পড়ি:

> তোমার কাঁঠালী গন্ধ নাহি রহে ছাপা,
> ছুটে আসে, ভেদ করি পাতার গম্বুজ।
> ঠিক করে হও নাই পাতা কিম্বা ফুল,
> দু'মনা করাই তব দুর্গতির মূল!

'গোলাপ' সনেটে গোলাপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি সাহিত্য-প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গোলাপকে বলেছেন 'ফুলের নবাব তুমি, নবাবের ফুল'। শুধু তাই নয়, আরো বলেছেন,

> সোহাগে গলিয়া তুমি হওবা আতর,
> গুম্ফাসনে বসে কর বেগম কাতর!

আমাদের প্রচলিত ধারণাকে এই বর্ণনা বিপর্যস্ত করে।

॥ ৫ ॥

কিন্তু প্রমথ-কবিমানসের এই-ই শেষ কথা নয়। কবিমানসের 'অন্বেষণে'র পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

রূপের মাঝারে চাহি অরূপ দর্শন
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গস্পর্শন।
খোঁজা জানি নষ্ট করা সময় বৃথায়,—
দূর তবে কাছে আসে, কাছে যবে দূর।
বিশ্রাম পায় না মন পরের কথায়,
অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অনাহত-সুর॥

কবির এই অরূপ-সন্ধান ও অনাগত সুরের অন্বেষণ যে ব্যর্থ হয় নি, তা অনুরাগী পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। উচ্চকোটির গীতিকাব্য-ভাবনা যে তাঁর অধিকারে ছিল, সে বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই।

সে সংশয় অপনোদিত হয় তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতার আলোচনায়। 'বিশ্বরূপ', 'বিশ্বকোষ', 'বিশ্বব্যাকরণ', 'আত্মপ্রকাশ', সনেটে তিনি জীবনবিরোধী বিশ্বরহস্যসন্ধানীদের ব্যঙ্গ করে বলেছেন,

বিশ্বসনে দিনরাত শুধু বোঝাপড়া,
সে ত নয় ঘর করা, করা সে ঝগড়া! ('বিশ্বকোষ')

বিশ্বরহস্যকে মহাকাব্যে ধরার বৃথা প্রয়াস না করে তিনি চুটকিতে গজল গাইবার পক্ষপাতী ছিলেন:

আমি চাই টেনে নিয়ে ছড়ানো প্রক্ষিপ্ত
অন্তরে সঞ্চিত করি আঁধার আলোক,
প্রতীক রচনা করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত,—
চতুর্দশ পদে বন্ধ চতুর্দশ লোক। ('বিশ্বরূপ')

তাই তিনি জীবনসায়াহ্নে নিরাশা ও ব্যর্থতার দ্বারা পরাভূত হন নি। তাঁর চুটকিতে বিশ্বদর্শন সার্থক হয়েছিল। তার প্রমাণ 'মুশকিল-আশান' সনেটের অন্তিম চতুষ্ক:

আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ,
কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা।

হৃদয়-ফকির জপে 'লা-আল্লা-ইলাল্লা'
আকাশেতে শুনি বাণী 'মুশ্‌কিল-আশান'।

কবির এই জীবনদর্শন ব্যর্থ হয় নি। তিনি তাঁর প্রিয়াকে আহ্বান করেছেন এই বলে :

প্রচ্ছন্ন রূপেতে আছ আচ্ছন্ন করিয়া
আমার সকল অঙ্গ, সকল অন্তর।
সকল ইন্দ্রিয় মোর জ্যোতিতে ভরিয়া,
যোগাও প্রাণের মূলে রস নিরন্তর।

জীবনরসিক দুঃখবিরোধী পঞ্চেন্দ্রিয়োপাসক : এই তাঁর যথার্থ পরিচয়।

আর দুটি সনেট উদ্ধার করার লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য কেননা এ দুটিতে বীরবলের কবিপ্রতিভা নিজেকে অনাবরণরূপে উদ্ঘাটিত করেছে এবং সত্যসঙ্গী ব্যঙ্গ ও পরিহাসকে ত্যাগ করে কবি উচ্চারণ করেছেন তাঁর কাব্যজীবনের ব্যর্থতা ও সার্থকতার শেষ ভরতবাক্য। এখানে কবির কণ্ঠ বিদ্রূপতীক্ষ্ণ নয়, তা গভীর ও নম্র। মৃদু কণ্ঠে অন্তরঙ্গ সুরে তিনি জীবনাসক্তির ও মানবজীবনের নিষ্ঠুর বিড়ম্বনার পরিচয় দিয়েছেন।

'রূপক' সনেটে জীবনানুরাগের ও প্রকৃতি-উপভোগের আন্তরিক গভীর পরিচয় আছে। ব্যঙ্গের নির্মোক খুলে ফেলে কবি আজ অন্তরঙ্গ সুরে তাঁর জীবনসত্যটি উচ্চারণ করেছেন :

কথনো অন্তরে মোর গভীর বিরাগ,
হেমন্তের রাত্রিহেন থাকে গো জড়িয়ে,
—যাহার সর্বাঙ্গে যায় নীরবে ছড়িয়ে
কামিনী ফুলের শুভ্র অতনু পরাগ॥
বাসনা যখন করে হৃদয় সরাগ,
শিশিরে হারানো বর্ণ, লীলায় কুড়িয়ে,
চিদাকাশে দেয় জ্বেলে, বসন্ত গড়িয়ে
কাঞ্চন ফুলের রক্ত চঞ্চল চিরাগ॥
কভু টানি, কভু ছাড়ি, মনের নিঃশ্বাস
পক্ষে পক্ষে ঘুরে আসে সংশয় বিশ্বাস॥
বসন্তের দিবা, আর হেমন্ত-যামিনী
উভয়ের দ্বন্দ্বে মেলে জীবনের ছন্দ।

দিবারাত্রে রঙ আছে, নিশাবক্ষে গন্ধ,—
স্বষ্টির সংক্ষিপ্ত সার কাঞ্চন-কামিনী॥

ইন্দ্রিয়াশ্রিত রূপজগতের কবি প্রমথ চৌধুরীর সম্পূর্ণ পরিচয়টি এখানে প্রকাশিত। অষ্টকে প্রকৃতি-রূপের যে সার্থক বর্ণনা, ষট্‌কে তা কবির জীবনে সত্যরূপে গৃহীত। কবির বৈরাগ্যবিরোধী জীবনদৃষ্টি অন্তিম যুগ্মকে বিধৃত হয়েছে।

আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বে বিড়ম্বিত মানবজীবনের অতি-পরিচিত নিষ্ঠুর সত্যটি 'প্রতিমা' সনেটে সর্বজনীন আবেদনে পাঠকের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। 'ভুল' সনেটে কবির স্মরণীয় উক্তিঃ 'হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার।' তবু নিরাশার সুরে কবি তাঁর কাব্যবীণার শেষ ছড়টি টানেন নি। সকল কবির যা চির-আকাঙ্ক্ষিত, আমাদের কবি তাকেই খুঁজেছেন, 'অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অনাহত স্বর' ('অন্বেষণ')। সেই অন্বেষণ, সেই জীবনাসক্তি, সেই বিড়ম্বনার, সেই ব্যর্থ প্রয়াসের ত্রুটিহীন কাব্যরূপায়ণ 'প্রতিমা' সনেটটি। কবির বেদনাহত কণ্ঠে মানবজীবনের সাধ ও আশার, সাধন ও ব্যর্থতার একটি সম্পূর্ণ রাগিণী ধ্বনিত হয়েছেঃ

প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ করে'।
আঁধারে আবৃত কত খুঁজে গুপ্ত খনি,
এনেছি তারার মত জ্যোতির্ময় মণি,—
রত্ন দিয়ে দেবীমূর্তি গড়িবার তরে।
স্ফটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধরে',
পরায়েছি শ্যামসাটি মরকতে বুনি
রক্তবিন্দু পারা দুটি সুলোহিত চুনি
বিন্যস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে।
প্রজ্জ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন,
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
মুকুতা-নির্মিত যুগ ঘন-পীন-স্তন,
সুকঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ।
অপূর্ব সুন্দর মূর্তি, কিন্তু অচেতন,—
না পারি পূজিতে কিম্বা দিতে বিসর্জন।

প্রমথ চৌধুরী মানবজীবনের এই ট্রাজেডির কবি। কিন্তু সে ট্রাজেডি তাঁকে দুঃখবাদী না করে' আনন্দবাদী করেছে।

সবুজপত্রের মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সাহিত্য-আন্দোলন প্রবর্তিত করেন এবং তার বাহক হিশেবে চলতি ভাষাকে গ্রহণ করেন। কেবল নিজেকে ও স্ব-গোষ্ঠীকে নয়, রবীন্দ্রনাথকেও তিনি এ পথে টেনে এনেছিলেন। অসাধারণ চিৎপ্রকর্ষ, অতুলনীয় রচনারীতি, গভীর মনীষা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির জোরে তিনি একটি সাহিত্য-আন্দোলনের প্রবর্তকরূপে বাংলা সাহিত্যসংসারে চিরখ্যাত থাকবেন।

এই চলতি ভাষার স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি গোড়াতেই উদ্ধার করি। তিনি 'কথার কথা' প্রবন্ধে বলেছেনঃ "আমি বাংলাভাষা ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানিনে, যাকে শ্রদ্ধা করি, তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে।······যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়!······ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ান নয়। যে কথাটা নিতান্ত নইলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশী ভিক্ষে, ধার, কিম্বা চুরি করে এনো না।" ('বীরবলের হালখাতা')। বীরবল আরো বলেছেন, "লেখকেরা যদি ভাষাকে সুকুমার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকে সুস্থ এবং সবল করবার চেষ্টা করেন, তা হলে বঙ্গসাহিত্যে আবার প্রাণ দেখা দেবে।" ('মলাট সমালোচনা')।

মুখের ভাষা ও লেখার ভাষার বিরোধ সম্পর্কে 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে মাতৃভাষা' প্রবন্ধে বীরবল মন্তব্য করেছেন, "একথা নিশ্চিত যে, আমাদের কথায় ও লেখায় যত অধিক অমিল হয়, তত আমরা সেটি অহংকারের এবং গৌরবের বিষয় বলে মনে করি। বাঙালি লেখকদের কৃপায় বাংলা ভাষায় চক্ষুকর্ণের বিবাদ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সেই বিবাদ ভঞ্জন করবার চেষ্টাটা আমি উচিত কার্য বলে মনে করি। সেই কারণেই

এদেশের বিদ্যাদিগ্‌গজের ‘স্থূল হস্তাবলেপ’ হতে মাতৃভাষাকে উদ্ধার করবার জন্য আমরা সাহিত্যকে সেই মুক্তপথ অবলম্বন করতে বলি, যে পথের দিকে আমাদের সিদ্ধাঙ্গনারা উৎসুক নেত্রে চেয়ে আছেন।”

এইসব অভিমতে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রমথ চৌধুরী চল্‌তি ভাষাকেই রাজটীকা দিতে চান এবং প্রয়োজন মত বাইরে থেকে শব্দ গ্রহণ করতে তাঁর আপত্তি নেই। এখন দেখা যাক প্রমথ চৌধুরী তাঁর রচনারীতিতে এই আদর্শকে কতটা সফল করতে পেরেছেন। ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী রাজপুত্র সুন্দরকে বলেছিল,

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে,
কথায় তাহাঁরা সব মনের গাঁট কাটে।

মনের গাঁট কাঁটার এই বিদ্যায় প্রমথ চৌধুরী ওস্তাদ নাগরিক ছিলেন। তাঁর রচনারীতিই সাফল্যের মূল। অন্নদাশংকর রায়ের কথায় বলতে পারি, “পাকা রাঁধুনি যা রান্না করে তাই উপাদেয়। প্রমথ চৌধুরীর এই রাঁধুনিপনা ছিল, তাই তাঁর রচনার বিষয় যা হোক সবটাতেই রচনার স্বাদ থাক্‌ত, তাঁর সব আলাপই রসালাপ।”

॥ ২ ॥

প্রমথ চৌধুরীর রচানারীতির প্রথম গুণ: আত্মসংযম—মিতভাষিতা। প্রাচীন ভারতে মিতভাষণের যে আদর ছিল তা এই থেকে বোঝা যায় যে, বৈয়াকরণ তাঁর সূত্রে একটি স্বরবর্ণ কমাতে পারলে পুত্রলাভের আনন্দ পেতেন। প্রমথ চৌধুরী প্রাচীন ভারতের মিতভাষণের ঐতিহ্যকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচনারীতির পরিচয় হচ্ছে: তন্বীশ্যামা-শিখরিদশনা। অল্প কথায় অনেক ভাব প্রকাশের দুরূহ ক্ষমতা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। এই ক্ষমতা তাঁর সহজাত নয়, তিনি অর্জন করেছিলেন। তিনি ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি বলতে পারতেন, তাই লাখ কথা বলার তাঁর দরকার হ’ত না। আমাদের অতিভাষণের দেশে তাঁর এই আত্মসংযম ও মিতভাষণ বিরল ব্যতিক্রম। ‘বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ’ প্রবন্ধে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন: “অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা

মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমাদের মনে স্থান পেত, তা হলে আমরা সিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য আত্মসংযম হতে ভ্রষ্ট হতুম না।” (‘বীরবলের হালখাতা’)।

প্রমথ চৌধুরীর লেখা পড়লে মনে হয় তিনি অবলীলাক্রমে লিখতেন। কিন্তু অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা যে এক জিনিষ নয়, তা আমরা বুঝি না। এ বিষয়ে চৌধুরী মহাশয় উপরিউক্ত প্রবন্ধেই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। আর এখানেই তাঁর রচনারীতির দ্বিতীয় গুণ। কলাবতের সাধনা তাঁর ছিল। সরস্বতীর প্রতি অনুগ্রহ করে তিনি লেখেন নি, সরস্বতীর অনুগ্রহ পাবার জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যে রূপ আছে, ভার নেই, ছায়া নেই।

হীরা মালিনীর পরিচয় দিতে গিয়ে ভারতচন্দ্র বলেছেন, “কথাতে হীরার ধার হীরা তার নাম।” প্রমথ চৌধুরীর মনে ছিল হীরার কাঠিন্য, তাঁর ভাষায় ছিল হীরার ধার ও ঝলক। বস্তুত এটাই তাঁর আদর্শ ছিল, “ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়।” হীরার এই ধার ও ঝলক প্রকাশ পেয়েছে পান্, এপিগ্রাম ও প্যারাডক্সের বহুল প্রয়োগে। প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতির প্রধান গুণ এখানেই—শ্লেষ ও প্রসাদ, brevity ও clarity। বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল মনোভাবকে তিনি সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে এনেছিলেন; তাই তার রচনারীতিতে এসেছে শ্লেষগুণ। তাঁর মন ছিল স্বচ্ছ, সাবেক কালের বা হাল আমলের কোন ঝাঁকুনি বা কুয়াশা তাঁর মনকে ঘোলাটে করতে পারে নি, ফলে তাঁর রচনারীতিতে এসেছে প্রসাদগুণ।

ভাষাশিল্পী হিসেবে তাই প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্ব অপরিসীম। ভাষাশিল্পীর পথ প্রলোভনে পিচ্ছিল। একদিকে সংস্কৃতভাষার আড়ম্বর, অপরদিকে ইংরেজির অমেয় ঐশ্বর্য—দু দিক থেকে প্রলোভন চৌধুরী মহাশয়কে হাতছানি দিয়েছে। কিন্তু তিনি আর্যমনের নির্মমতা ও নিরাসক্তির উত্তরাধিকারী, প্রাচীন বৈয়াকরণের পদচিহ্ন-অনুসারী। তিনি সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করে এগিয়ে গেছেন। পরিপাটি রচনার বাহক হিশেবে তন্বী রচনারীতি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। চলতি ভাষার

প্রকাশ-ক্ষমতা তিনি সাহিত্যের আমদরবারে দেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁর রচনায় বাংলার ঘরোয়া ফ্রেজ ও ইডিয়ম সাহিত্যে ঠাঁই পেল; বাংলা বাক্য সুদীর্ঘ periodic sentence-এর নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বচ্ছ, সাবলীল ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল; বাংলা ভাষার syntax আপন স্বরাজ্য ফিরে পেল। প্যারাডক্স ও এপিগ্রাম—এই দুই তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রে তিনি বাংলা গদ্যকে শাণিত ও পাঠকমনকে চমকিত করে তুললেন। সর্বোপরি চল্‌তি ভাষাকে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা স্বীকার করিয়ে নিলেন। প্রাক্-সবুজপত্র যুগে রবীন্দ্রনাথ চল্‌তি ভাষার চর্চা করেন নি, তা নয়; তার প্রমাণ, 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র,' 'পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ,' 'ছিন্নপত্র,' 'শান্তিনিকেতন;' ও 'গোরা'র সংলাপ। কিন্তু সবুজপত্রের পাতাতেই রবীন্দ্রনাথ সরকারীভাবে চল্‌তি ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করে নিলেন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই চল্‌তি গদ্যেরই চর্চা করেছেন।

॥ ৩ ॥

এবার প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের উপরোক্ত গুণগুলির পরিচয় দিচ্ছি।

প্যারাডক্সের উদাহরণ:

"তোমাদের মেয়ে প্রায় পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায় মেয়ে। বুড়ো হলেও তোমাদের ছেলেমি যায় না,—ছেলেবেলাও আমরা বুড়োমিতে পরিপূর্ণ। আমরা বিয়ে করি যৌবন না আসতে, তোমরা বিয়ে কর যৌবন গত হলে। তোমরা যখন সবে গৃহপ্রবেশ কর, আমরা তখন বনে যাই।" ('আমরা ও তোমরা')।

এপিগ্রামের উদাহরণ:

"ভট্টাচার্য-মতে, জীবনে ফেন ফেলে দিয়ে ভাত খেতে হয়, আর কাব্যে ভাত ফেলে দিয়ে ফেন খেতে হয়; কিন্তু গোস্বামি-মতে কি জীবনে কি কাব্যে একমাত্র গলা ভাতেরই ব্যবস্থা আছে।" ('ফরমায়েসি গল্প')।

"সমাজে আগে হয় বিয়ে পরে সন্তান, তারপর মৃত্যু; আর কাব্যে হয় আগে ভালবাসা, তারপর বিয়ে, নয় মৃত্যু। এককথায় মানুষের জীবনে যা হয়, তার নাম প্রাণান্ত! কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত, নয়

বিয়োগান্ত ; হয় ঘটক, নয় ঘাতক হওয়া ছাড়া কবিদের আর উপায় নেই।" (তদেব)।

খাঁটি বাংলা ফ্রেজ-ইডিয়ম ও স্ল্যাং-এর উদাহরণ ঃ

"আমি শত চেষ্টা করেও 'রিণী'র মনকে আমার করায়ত্ত করতে পারিনি, তার জন্য আমি লজ্জিত নই—কেন না আকাশ বাতাসকে কেউ আর মুঠোর ভিতর চেপে ধর্‌তে পারে না। তার মনের স্বভাবটা অনেকটা এই আকাশের মতই ছিল, দিনে দিনে তার চেহারা বদলাত। আজ ঝড়-জল-বজ্র-বিদ্যুৎ, কাল আবার চাঁদের আলো, বসন্তের হাওয়া। একদিন গোধুলি আর একদিন কড়া রোদ্দুর। তা ছাড়া সে ছিল একাধারে শিশু, বালিকা, যুবতী আর বৃদ্ধা। যখন তার স্ফুর্তি হত, তার আমোদ চড়্‌ত, তখন সে ছোট ছেলের মত ব্যবহার করত; আমার নাক ধরে টান্‌ত, চুল টানত, মুখ ভেংচাত, জিভ বার করে দেখাত।" ('চার-ইয়ারী-কথা')।

প্রমথ চৌধুরী অজস্রপ্রসূ লেখক ছিলেন না, তিনি লিখেছেন অল্প। তিনি দিয়েছেন মুষ্টিভিক্ষা—কিন্তু তা স্বর্ণমুষ্টি! তাঁর মতো সচেতন ভাষাশিল্পী—শব্দের অসিক্রীড়ায় দক্ষ শিল্পী—বাংলা গদ্য ভাষাকে সাবলীল ও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ফরাসি-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিরোধ-অলংকার ও ব্যঙ্গ-কটাক্ষের প্রয়োগে তিনি ফরাসি-স্বাধর্মের অনুসারী। চিন্তায় ও প্রকাশে তিনি অস্বাভাবিকতা ও অস্বচ্ছতা বরদাস্ত করেন নি। তাঁর হাতে তাই চল্‌তি বাংলা গদ্য কেবল রাজসম্মান পায় নি, তা স্বচ্ছ ও সাবলীল হয়েছে, লঘু ও গাঢ়বন্ধ হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী ভাষার ক্ষেত্রে রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর 'আত্মকথা'য় বলেছেন, "আমি কৃষ্ণনাগরিক। কৃষ্ণনগর আমার মুখে ভাষা দিয়েছে।" কৃষ্ণনগরের রাজসভা-কবি ভারতচন্দ্রের মতো তিনিও শ্লেষ ও ব্যঙ্গে, বক্রোক্তি ও বিরোধাভাসে নিপুণ ছিলেন। সেকালের কাল্‌চারের পীঠস্থান কৃষ্ণনগরের সুশ্রাব্য মার্জিত ভাষারূপকে প্রমথ চৌধুরী একালের পীঠস্থানে সাহিত্যের আমদরবারে চালাতে চেয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে এটাই প্রধান কথা।

॥ ৪ ॥

প্রমথ চৌধুরী চেয়েছিলেন আমরা ফরাসী গদ্যের অনুশীলন করি। সাহিত্যে আনাড়িপনা, ভাষাপ্রয়োগে শৈথিল্য ও উদাসীনতা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে রাজি হন নি। তিনি বাঙালি লেখককে ইংরাজি গদ্যরীতি ত্যাগ ও ফরাসি গদ্যরীতি গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "সঙ্গীতের মত সাহিত্যও যে একটি আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত আর্ট যে আয়ত্ত করা যায় না, এ সত্য আমরা উপেক্ষা করতে শিখেছি। ইংরেজী গদ্যের কুদৃষ্টান্তই এর একমাত্র কারণ।......ইংরেজী সাহিত্যর amateurishness আমরা সাদরে অবলম্বন করেছি, কেননা যেমন তেমন করে যা-হোক-একটা-কিছু লিখে ফেলার ভিতর কোনোরূপ আয়াস নেই, কোনোরূপ আত্মসংযম নেই। ফরাসী সাহিত্যের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দুইই লেখকদের সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দেয়।" ('ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়', প্রবন্ধ-সংগ্রহ)।

ফরাসী সাহিত্য ভাষাকে লঘু ও তীক্ষ্ণ, পরিচ্ছিন্ন ও পরিপাটী, সংযত ও ভদ্র হতে শেখায়, এই হল চৌধুরী মহাশয়ের অভিমত। "এ শিক্ষা আমরা সহজেই আত্মসাৎ করতে পারি, কেননা আমার বিশ্বাস, বাংলার সঙ্গে ফরাসী ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের ভাষাও মূলতঃ এক, এবং বিদেশি শব্দে তা ভারাক্রান্ত নয়। আমাদের ভাষার অন্তরেও ফরাসি ভাষার গতি ও স্ফূর্তি নিহিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্যগ্রন্থ জর্মানের ন্যায় স্থূলকায় গুরুভার শ্লীপদ ও গজেন্দ্রগামী ভাষায় রচিত হওয়া অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত, এবং তাঁর রচনা ফরাসি সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস্ গণ্য হত।" (তদেব)।

উল্লিখিত প্রবন্ধে চৌধুরী মহাশয় ফরাসী গদ্য থেকে আমরা কী শিক্ষা পেতে পারি, সে আলোচনা প্রসঙ্গে গদ্যের গুণ ও ত্রুটি বিচার করেছেন। তাঁর মতে ফরাসি গদ্য আদর্শ গদ্য এবং ভোল্‌ত্যের ও উগো এর দুই আদর্শ লেখক। ভোল্‌ত্যেরের হাতে ক্লাসিক ফরাসি গদ্য

লঘু ও তীক্ষ্ণ, চোস্ত ও সাফ হয়েছিল। আর উগোর হাতে রোমান্টিক ফরাসি গদ্যের সৌন্দর্য খোলে ও শব্দসম্পদ বাড়ে। এই দুই গদ্যশিল্পী আমাদের নমস্য বলে তিনি মনে করেন।

ফরাসী গদ্যের যে গুণগুলি চৌধুরী মহাশয়কে আকৃষ্ট করেছিল, তা হচ্ছে—ঐক্যসমতা, প্রসাদগুণ, ভদ্রতা (সারল্য), সংযম। প্রাক্-ষোড়শ শতক যুগের যে ফরাসি গদ্য, গ্রাম্য বর্বরতা ও দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যদোষে তা দুষ্ট। রাবলের গদ্যই তার প্রমাণ। তা জোড়াতাড়া দেওয়া ভাষা। ষোড়শ শতকে কবি মালের্ব গদ্যের সংস্কার করেন। বাক্যের পদনির্বাচন ও পদযোজন, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সংস্কার করেন। প্রাদেশিক শব্দ, ইতর শব্দ ও পাণ্ডিত্যগন্ধী পারিভাষিক শব্দ তিনি ফরাসি গদ্য থেকে বহিষ্কার করেন। সেই সঙ্গে বাক্যের গঠন যাতে পরিপাটী হয় ও পদান্বয় সুসমঞ্জস হয়, সে দিকেও জোর দেন। মালের্ব-প্রবর্তিত এই সংস্কারগুলি ফরাসী গদ্যকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। তারপর সতেরো শতকে সমালোচক বোয়ালো গদ্যরচনার ত্রুটিগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। ভাষার কৃত্রিমতা, বৃথা বাগাড়ম্বর, উপমার আতিশয্য, অনুপ্রাসের ঝঙ্কার ও অলঙ্কারের চাক্‌চিক্যের বিরুদ্ধে তিনি জীবনব্যাপী অভিযান চালান। ফলে ফরাসি গদ্য থেকে অত্যুক্তি ও অতিবাদ, কষ্টকল্পনা ও অবোধ পাণ্ডিত্য দূর হয়ে যায়। ফরাসি গদ্য তাই লেখককে সংযম শিক্ষা দেয়, আপাতখ্যাতির পথ থেকে সরিয়ে আনে, ভাষার নির্মম সরণিতে এগিয়ে নিয়ে যায়। পাস্‌কাল, বস্যুয়ে, রাসীন, মলেআর, দেকার্তে এই পথেই সংযত অনুচ্ছ্বসিত সুশৃঙ্খল গদ্যের চর্চা করে খ্যাতি লাভ করেছেন। তারপর ভোলত্যেরের হাতে ফরাসি গদ্য চরম লঘু ও তীক্ষ্ণ, চোস্ত ও সাফ্ হয়ে ওঠে। পরে উগো, ফ্লোবেঅর, মোপাসাঁর হাতে ফরাসি গদ্য শব্দসমৃদ্ধি ও সাবলীলতা লাভ করেছে।

ফরাসি গদ্যের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর যে উদ্যম ও উৎসাহ, তা থেকে তাঁর মানসিক প্রবণতা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, গদ্যের কোন্ রূপকে আদর্শ বলে এবং বাংলা গদ্যের কোন্ পথে যাওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। বাংলা গদ্য যে ফরাসি গদ্যের রীতি ও পথানুসারেই মুক্তি পাবে, তা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। আর প্রমথ চৌধুরীর গদ্য পর্যালোচনা

করে আমার মনে হয়েছে তিনি ফরাসি গদ্যশিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন আল্‌ফঁস্‌ দোদে-কে।

আল্‌ফঁস্‌ দোদে (১৮৪০-৯৭) মোপাসাঁর সমসাময়িক এবং গল্প লিখে তিনিও খ্যাতি লাভ করেন। তবে তাঁর খ্যাতির ভিত্তি হল দক্ষিণ ফ্রান্সের সুন্দর বর্ণনা এবং সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রাঙ্কন। দোদের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য এখানে পাই। ব্যঙ্গপ্রধান রচনার উপযোগী বৈশিষ্ট্য-গুলি তাঁর গদ্যে লক্ষ্য করা যায়। সেই এপিগ্রাম্‌, প্যারাডক্স, আয়রনি, শ্লেষ, ব্যাজস্তুতি দোদের রচনায় রয়েছে। বার্লেক্স-জাতীয় রচনায় আধা-বিদ্রূপ মেশানো ভঙ্গিতে সযত্নচয়িত শাণিত তীক্ষ্ণ বাক্যাংশ ও শব্দের ছিটাগুলিতে তিনি প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করে ফেলতেন। এই গুণগুলিই প্রমথ চৌধুরী সযত্নে চর্চা করেছিলেন। এবং প্রমথ চৌধুরীর রচনা ও দোদের রচনা পাশাপাশি রেখে পড়লে এই সাদৃশ্য বারেবারেই ধরা পড়ে। দোদে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু তাঁর সর্বাধিক খ্যাতি দুটি গ্রন্থের জন্য। একটি হ'ল Letters de mon moulin (১৮৬৯), অপরটি Tartarin de Tarascon (১৮৭২)। প্রথমটিতে তাঁর নিজস্ব প্রভেন্স-অঞ্চলের নানা রসালো কাহিনী, দ্বিতীয়টিতে দখ্‌নে ফরাসিদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা। উভয় গ্রন্থেই দোদের নিসর্গবর্ণনানৈপুণ্য ও ব্যঙ্গবিদ্রূপপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

প্রমথ চৌধুরী যে দোদের গদ্যরীতি, বাক্‌ভঙ্গিমা এবং জীবনদর্শন দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার একটি প্রমাণ দিয়ে এই আলোচনা শেষ করছি। Letters de mon moulin গ্রন্থের অন্তর্গত Le chevre de M. Seguin ('মঁসিয়ে সগ্যার ছাগল') শীর্ষক কাহিনীর প্রথম কয়েকটি বাক্য এখানে তুলে দিচ্ছি। তৎকালীন রোমান্টিক স্বাধীনচেতা বড় বড় আদর্শে পূর্ণ অথচ ভীরু বোকা টাইপের কবিদের লক্ষ্য করে—উগোর 'Notre-Dame de Paris' (১৮৩১) উপন্যাসের একটি চরিত্র—কবি Pierre Gringoire-র প্রতি উদ্দিষ্ট এই রচনাটিতে দোদে ঐ শ্রেণীর ন্যাকাবোকা কবিদের বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। এই ব্যঙ্গবিদ্রূপ সত্যি উপভোগ্য।

রচনাটির আরম্ভ এই রকম:

A M. Pierre Gringoire, poete lyrique a Paris

Tu seras bien tonjours le meme, mon pauvre' Gringoire !

Comment ! on t'offre une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris, et tu as' l'aplomb de refuser... Mais regarde-toi, malheureux garcon ! Regarde ce pourpoint troue, ces chausses en deroute, cette, face maigre qui crie la faim.

Voila pourtant ou t'a conduit la passion des belles rimes ! Voila ce que t'ont valu dix ans de loyaux services dans les pages du sire Apollo......Est-ce que tu n'as pas honte, a la fin ?

Fais-toi donc chroniqueur, imbecile ! fais-toi chroniqueur ! Tu gagneras de beaux nobles a la rose, tu auras ton couvert chez Brebant, et tu pourras te montrer les jours de premiere avec une plume neuve a ta barrette .....

Non ? Tu ne veux pas ? Tu pretends rester libre a ta guise jusqu'an bout......Eh bien, ecoute un peu l'historie de la chevre de M. Seguin. Tu verras ce que l'on gagne a vouloir vivre libre.

যিনি অল্প বিস্তর ফরাসি জানেন, তিনিই উদ্ধৃতাংশের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুরটি ধরতে পারবেন। এর মর্মার্থ হল: "ওহে বেচারী কবি! তোমাকে পারীর এক নামজাদা দৈনিক পত্রিকায় রিপোর্টারের কাজ দেওয়া হল, তা তুমি নিলে না! তোমার ছেঁড়া পোষাক আর শুক্‌নো বদনখানি ভাল করে দেখ! কবিতা লিখে তোমার কি লাভটা হয়েছে! দশ বছর ধরে ঘাস কেটেছ! এখন লজ্জিত হও, চলে এস। ওহে বোকা, রিপোর্টার হও, দুটো পয়সা হাতে আস্‌বে, ভাল রেস্তোঁরায় খেতে পাবে, আর তোমার খ্যাতি বাড়বে। কি? না বলছ? রাজি নও? তুমি দাসত্ব করবে না? চাক্‌রি নেবে না? স্বাধীন কবি থাকবে?

'তাহলে মঁসিয়ে সগ্যাঁর ছাগলের যে দশা হয়েছিল, তোমারো তাই হবে। আজাদি রাখতে গিয়ে সে ছাগলের প্রাণটি খোয়া গেল, তবে শোন সে কাহিনী।"

এর থেকেই উদ্ধৃতাংশের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুরটি অনুধাবন করা যায়। আর মূল ফরাসি পড়লেই পাকা হাস্যরসিকের সকল বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। দোদের তূণে এপিগ্রাম-প্যারাডক্স, শ্লেষ-বিদ্রূপের বাণ মজুত ছিল এবং তা তিনি অনায়াস-নৈপুণ্যে ব্যবহার করতেন। বাক্যগঠন-ভঙ্গিটিও এই মনোভাবের পোষকতা করে।

এখানেই প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আল্‌ফঁস্ দোদে-র সমধর্মিতা।

বীরবলী প্রবন্ধরীতি

'সবুজপত্রে'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। তিনি কেবল 'সবুজপত্র' সম্পাদনা করেন নি, সবুজপত্রীদের একটি গোষ্ঠীও গড়ে তুলেছিলেন। এই গোষ্ঠীর লেখকদের লেখায় একটি নোতুন যুগের আভাস পাওয়া গেল। চিন্তায়, বাচনে, প্রকাশভঙ্গিতে, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় একটি নোতুন মনের পরিচয় প্রকাশ পেল। কী উদ্দেশ্য নিয়ে 'সবুজপত্রে'র প্রতিষ্ঠা, তা প্রমথ চৌধুরী একাধিকবার আলোচনা করেছেন। আমাদের সমাজে ও সংসারে যে জাড্য, স্থবিরতা ও অকালবৃদ্ধতা পাকাপোক্ত আসন নিয়ে বসেছে, তার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরী প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য, আমাদের সমাজে মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠা। আর এ যৌবন আসলে ইউরোপের বেগবান প্রাণচঞ্চল সুধ্যান মনের যৌবন। সত্যেন্দ্রনাথের "যৌবনে দাও রাজটীকা" কবিতাটিকে প্রমথ চৌধুরী এ ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। নির্বিশেষ সংস্কৃতি সাধনার মধ্য দিয়ে পরিবর্তমান বিশ্বের বিশ্বপ্রবাহে অবগাহন না করলে মনের মুক্তি ঘটে না এবং মানসিক জাড্য ও তামসিকতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না, এ কথা প্রমথ চৌধুরী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন যৌবন মানবধর্ম, তাকে অস্বীকার করার মত মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি যৌবন আর জীবনে তার প্রয়োগ ঘটেছে ইউরোপে; এটি প্রমথ চৌধুরীর বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাসের আলোয় তিনি বাঙালি-মনকে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর সমগ্র সাহিত্য-সাধনাকে এই আখ্যায় ভূষিত করলে অন্যায় হবে না যে, তা মানসিক যৌবনের সমর্থনে রচিত। খুব স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন, "প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়; বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড় জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণীজগতের রক্ষার জন্য নিত্য

নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক—প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস। এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য।" ('যৌবনে দাও রাজটীকা'—সবুজপত্র, ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ)।

তাই এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে, প্রমথ চৌধুরী পুরনোর বিপক্ষে ও নোতুনের পক্ষে, মানসিক বার্ধক্যের বিপক্ষে ও যৌবনের পক্ষে ছিলেন। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে মনোভঙ্গীর দিক থেকে তিনি সর্বাংশে স্বতন্ত্র ছিলেন, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই। প্রমথনাথ এই নোতুন চিন্তার বাহন যে গদ্যকে করেছিলেন, তাও নোতুন, যা 'বীরবলী গদ্য' আখ্যায় ভূষিত হয়েছে। কথ্যভাষাশ্রয়ী বীরবলী গদ্যের যে কটি প্রধান লক্ষণ, তা এই মানস-প্রসূত: যুক্তিশৃঙ্খলা-প্রবণতা, বাক্‌সংযম, দীর্ঘ বাক্যের অনুপস্থিতি, হ্রস্ব বাক্যের প্রাধান্য, ক্রিয়াপদের লঘুতা, প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতা, যথাযথতা, ব্যঙ্গপ্রবণতা এবং তীক্ষ্ণাগ্র মন্তব্যের বহুল-প্রয়োগ। জাড্যলেশহীন তারুণ্যের সাধনাতেই বাংলা সাহিত্যের মুক্তি, এই বিশ্বাসেই তিনি বলেছিলেন, "এই নূতন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে তা মনে প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাবসকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে দিতে পারি, তবেই তা সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করি, আমাদের এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করবার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে। সাহিত্য গড়তে কোনও বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম।"

প্রমথ চৌধুরীর এই আশা ব্যর্থ হয় নি, বর্তমান বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যই তার প্রমাণ।

॥ ২ ॥

বাংলা প্রবন্ধরীতি প্রমথ চৌধুরীতে এসে নোতুন পথে যাত্রা করল, এ কথা স্বীকার্য। প্রাক্-বীরবলী ও বীরবলোত্তর বাংলা প্রবন্ধরীতিতে একটি স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাক্-বীরবলী যুগের বাংলা প্রবন্ধে wisdom-এরই প্রাধান্য, বীরবল-যুগে wisdom in a smiling mood-এরই সমাদর। প্রাক্-বীরবলী যুগের প্রবন্ধরীতিকে যদি কোনো নাম দিতে হয়, তা হলে বলি, তা বঙ্কিমী-প্রবন্ধরীতি। এই রীতির পিছনে যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল, তার মূল লক্ষণ হল: সমষ্টিচেতনা, কল্যাণমুখিতা, আদর্শবাদিতা এবং অনিবার্যভাবেই ভাবোচ্ছ্বাস। আর বীরবলী প্রবন্ধরীতির পিছনে যে মানসিকতা বর্তমান, তার মূল লক্ষণগুলি এর বিপরীত: ব্যক্তিচেতনা, বিশ্বমানবিকতা, দৃঢ় প্রকৃতিস্থতা বা স্যানিটি এবং ভাবালুতামুক্তি। এর সঙ্গে এসেছে রসিকতা ও ব্যঙ্গপ্রবণতা, পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও মননশীলতা, নিবিড় ঐহিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এক কথায়, তা শিক্ষিত মানসের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিযজ্ঞে নিয়োজিত। বঙ্কিমী প্রবন্ধরীতিতে প্রবন্ধকারের ব্যক্তিমানসটিই প্রাধান্য লাভ করে নি, সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে সমাজ ও স্বদেশ-কল্যাণে অনুপ্রাণিত মনোভঙ্গী। আর বীরবলী প্রবন্ধরীতিতে ও পরবর্তী কালের প্রবন্ধ-রীতিতে প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তিমানস, এখানে আর সবই গৌণ। বঙ্কিম, ভূদেব, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, শিবনাথ, হরপ্রসাদ পর্যন্ত উনিশ শতকী প্রবন্ধকারবৃন্দ এবং বর্তমান শতকের গোড়ায় রামেন্দ্রসুন্দর, ঠাকুরদাস, পাঁচকড়ি, ক্ষেত্রমোহন, বিপিনচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, রাখালদাস, সুরেশচন্দ্র, রজনীকান্ত, যোগেশচন্দ্র, গিরিজাশঙ্কর প্রমুখ প্রাবন্ধিকদের মানসে কল্যাণচিন্তা সক্রিয়ভাবে বর্তমান এবং তা-ই তাঁদের প্রবন্ধরচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে এঁদের প্রবন্ধরীতিতে যুক্তির সঙ্গে নিষ্ঠার, চিন্তার সঙ্গে সংস্কারের, সাহিত্যচেতনার সঙ্গে সমাজ-চেতনার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। নির্বিশেষ সংস্কৃতিসাধনা, যা দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যায়—তা এঁদের আকৃষ্ট করে নি। মূলতঃ

ভারতমুখী চেতনার দ্বারা এঁরা পরিচালিত হয়েছিলেন, ফলে এঁদের লেখায় ধর্ম, ভারত-সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। এঁদের প্রবন্ধ সেইজন্য বিষয়নির্ভর বা গ্রন্থনির্ভর, তা কেবল প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিমানসটিকে পরিস্ফুট করার কাজে নিযুক্ত হয় নি।

প্রমথ চৌধুরীতে প্রবন্ধরীতির পরিবর্তন সাধিত হল, মনোভাবের পরিবর্তনের ফলে। নবীন উৎসাহ ও অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে সমগ্র বিশ্বসংস্কৃতিক্ষেত্রে পরিভ্রমণের ক্লান্তিহীন আনন্দে তা উজ্জীবিত। বিশ্ববীক্ষায় তৎপর বিদগ্ধ মার্জিত পরিশীলিত রসিক মনের হাসির আলোকে উজ্জ্বল একটি প্রবন্ধলোকে আমরা উত্তীর্ণ হই প্রমথ-প্রবন্ধাবলীতে। বিষয়বস্তু এখানে প্রধান নয়, প্রধান বিষয়বস্তুর ভাষ্যকার-মানসটি। প্রমথ-পর্বের বাংলা প্রবন্ধকে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যসৃষ্টি বলেই আমরা গ্রহণ করতে পারি। এখন আর প্রবন্ধ বলতে 'চিন্তাগর্ভ অনতিদীর্ঘ গদ্যরচনা'কে বোঝায় না, বা 'তথ্য, যুক্তি ও সিদ্ধান্তের পরস্পর অন্বয়ের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধ গদ্যাংশ'কে বোঝায় না। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার আজ আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে, চিন্তার ক্ষেত্রে কোনপ্রকার গণ্ডীকেই আমরা এখন আর স্বীকার করি না। আর তা হয়েছে 'সবুজপত্রে'র কল্যাণে।

বাংলা গদ্য তার জন্ম থেকে সংবাদপত্রের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়েছে। বাংলা প্রবন্ধরীতিতেও সংবাদপত্রের প্রভাব পড়েছে। বীরবলী প্রবন্ধরীতির সঙ্গে বঙ্কিমী রীতির বড় পার্থক্য এখানে যে, বীরবলী-রীতি সংবাদপত্রের রীতিকে অতিক্রম করে গেছে। তার আগে বাংলা প্রবন্ধরীতি ছিল বিষয়বস্তুনির্ভর। বঙ্কিমী প্রবন্ধরীতি বিষয়গত আলোচনায় সীমাবদ্ধ, ফলে সেখানে প্রবন্ধের গদ্য সংবাদপত্রের মন্থরগতি গদ্যের অনুসারী। সেকালের সংবাদপত্রের উপজীব্য সমসাময়িক বাঙালি সমাজ ; বঙ্কিমী-প্রবন্ধের উপজীব্যও একই। ফলে গত শতকে এই দুই প্রবন্ধরীতি ও গদ্যরীতি ভিন্নতর চেহারায় স্বপ্রতিষ্ঠ হয় নি। সংবাদপত্রের গদ্যে ব্যক্তিচেতনা অনুপস্থিত, সমষ্টিচেতনা প্রবল। বঙ্কিম-অনুসারী প্রবন্ধেও তাই হয়েছে। ফলে সেখানে প্রবন্ধরীতি ধূসর অনামিকতায় আচ্ছন্ন, ব্যক্তিচেতনা সেখানে অবলুপ্ত।

এই অবস্থায় প্রমথ চৌধুরী এলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত প্রবন্ধরীতি

নিয়ে—যা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, স্বাতন্ত্র্যে প্রখর, বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত। একটি ঘরোয়া পরিবেশ সৃজন করে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের কৌশল বাংলা প্রবন্ধে এই প্রথম দেখা গেল। কথাভাষাশ্রয়ী গদ্য-রীতির ধাবৎশক্তি, সাবলীলতা ও আলাপধর্মিতাগুণে সমর্থিত হল এই অন্তরঙ্গ বাতাবরণ। ফলে প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিমানসের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। একটি নোতুন প্রবন্ধরীতি প্রতিষ্ঠিত হল। এই প্রবন্ধরীতি যদি এ দেশে কারুর কাছে ঋণী থাকে, তা হল রবীন্দ্র-প্রবন্ধসাহিত্য। তবে এ দুয়ের চরিত্রগত সাদৃশ্য অল্পই, বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সামান্য মিল আছে।

॥ ৩ ॥

এখন বিচার্য—প্রমথ চৌধুরীর এই প্রবন্ধরীতির আদর্শ কী? প্রমথ চৌধুরী একাধিকবার এ বিষয়ে তাঁর আদর্শরূপে স্বীকার করেছেন মঁতেনের প্রবন্ধাবলী। বস্তুতঃ 'প্রবন্ধ' যে স্বতন্ত্র সাহিত্যকর্ম, তা মঁতেনই প্রথম দেখিয়েছেন। মাইকেল দ্য মঁতেন (১৫৩৩-১৫৯২) সম্ভ্রান্ত নোবল্ বংশের সন্তান। গ্রীক ও লাতিন ভাষায় তিনি প্রথম যৌবনেই দক্ষতা লাভ করেছিলেন, এ ছাড়া মাতৃভাষা ফরাসিতে তাঁর অধিকার সর্বস্বীকৃতি লাভ করেছিল। বোর্দোর আইনসভায় তিনি উপদেষ্টা নির্বাচিত হন এবং ফ্রান্সের সম্রাট দ্বিতীয় হেনরীর অনুগ্রহ লাভ করেন; মধ্যবয়সে তিনি মঁতেনের দুর্গ, জমিজমা ও দুটি গ্রামসমেত এক বিশাল সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন ও লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন। বাকি জীবনটা তিনি লেখাপড়াতেই কাটিয়েছেন। পারী-নগরীর ভক্ত মঁতেনের রাজসভায় প্রবেশের অবাধ ছাড়পত্র ছিল এবং তিনি দ্বিতীয় ও চতুর্থ হেনরীর বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে যে দলাদলি পারীর রাজনৈতিক আবহাওযাকে দূষিত করে তুলেছিল, তার থেকে তিনি দূরে সরে যান ও নিজ দুর্গপ্রাসাদে লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়টি তাঁর জীবনে মূল্যবান। তিনি নিজেই বলেছেন:

"When I lately retired myself to my own house with

a resolution, as much as possibly I could, to avoid all manner of concern in affairs, and to spend in privacy and repose the little remainder of time I have to live, I fancied I could not more oblige my mind than to suffer it at full leisure to entertain and divert itself... but I find that, quite the contrary, it is like a horse that has broken from his rider, who voluntarily runs into a much wilder career than any horseman would put him to, and creates me so many chimaeras and fantastic monsters, one upon another, without order or design, that, the better at leisure to contemplate their strangeness and absurdity. I have begun to commit them to writing, hoping in time to make them ashamed of themselves."

এইভাবে অশান্ত চিত্ত-অশ্বের উদ্দামতাকে বিক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে মুক্তি দিতে গিয়ে মঁতেন 'Essay'-এর সৃষ্টি করেন। ১৫৮০-তে মঁতেনের "Essaies" প্রকাশিত হল; সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নোতুন পথের সন্ধান মিলল। ফরাসিতে 'Essay' কথার অর্থই হল কোনও নোতুন প্রয়াস— যা অস্থায়ী বা অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত প্রয়াসই গাঢ়বদ্ধ সৃষ্টিকর্ম 'রচনা'য় (Essay) পরিণত হল। এই "Essaies" রচনাসংগ্রহে মঁতেন প্রচলিত সাহিত্যরীতি ও সংস্কারকে অস্বীকার করলেন। যুক্তি-তথ্যসমন্বিত বিষয়নির্ভর গাঢ়বদ্ধ সংহত আলোচনার (Treatise, Discourse, Dissertation) ধারাটিকে মঁতেন সবলে অস্বীকার করে বললেন, এই নোতুন সাহিত্যপ্রয়াসের (Essay) জন্য তিনি কোনও কৈফিয়ত দিতে রাজী নন। এগুলিকে তিনি বলেন, "These are fancies of my own", পাঠক যেন কোনও প্রত্যাশা না রাখেন, "Let nobody insist upon the matter I write, but my method in writing it: let them observe in what I borrow, if I have known how to choose what is proper to raise or help the invention, which is always my own;

for I make others say for me what, either for want of language or want of sense, I cannot so well myself express.” বিষয়বস্তুর ওপর মঁতেন জোর দেন নি, তিনি পাঠকের মনোযোগ দাবি করেছেন বলার ভঙ্গীর প্রতি। কী বলা হল, তার চেয়ে মূল্যবান কেমন করে বলা হল। ‘প্রবন্ধাবলী’ দু খণ্ড প্রকাশ করে মঁতেন ইতালি ভ্রমণে যান (১৫৮৩) সতেরো মাসের জন্য। এই ভ্রমণের ওপর তিনি যে দিনলিপি লেখেন, তা উচ্চাঙ্গের ভ্রমণ-সাহিত্য। গৃহে ফিরে অগ্নিদাহে, দুর্ঘটনায়, রোগে দুঃখে, মানসিক অশান্তিতে তিনি জীবনের বাকি ক’টা দিন কাটান। শেষ খণ্ড—তৃতীয় খণ্ড ‘প্রবন্ধাবলী’ মঁতেন দুঃখ ও রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেই প্রকাশ করেন এবং ষাট বছর বয়সে এই সংসার থেকে চিরবিদায় নেন।

‘প্রবন্ধাবলী’ (তিন খণ্ড) ও ইতালি-ভ্রমণ-ডায়েরি: মঁতেনের সাহিত্যকীর্তি এইমাত্র। কিন্তু ‘প্রবন্ধাবলী’তে তিনি যে সাহিত্যসৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে দিলেন, তা তাঁকে অবিনাশী গৌরবের অধিকারী করেছে। অধুনা সাহিত্যিকমূল্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ বা রচনা বলতে আমরা যা বুঝি তার পথিকৃৎ মঁতেন। ‘বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব’, ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার,’ ‘কৃষ্ণচরিত্র’—আলোচনা-জাতীয় গ্রন্থ (Treatise, Dissertation)। আর প্রমথ-প্রবন্ধাবলী ‘রচনা’ (Essay)। এই পার্থক্যের মূলে আছেন মঁতেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর সাহিত্যগুরু মঁতেনের প্রবন্ধাবলী মূল ফরাসিতে পড়েছিলেন এবং তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এ কথা অনস্বীকার্য।

মঁতেন আধুনিক প্রবন্ধসাহিত্যের জন্মদাতা। তাঁর আগেকার ইংরেজী প্রবন্ধ ও পরের ইংরেজী প্রবন্ধে যে চারিত্রিক পার্থক্য ঘটেছে, তার মূলে আছেন তিনিই। মঁতেনের প্রবন্ধাবলীর প্রথম ইংরেজী অনুবাদ হয় ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে। অনুবাদক জন ফ্লোরিও। তারপর চার্লস কটন অনুবাদ করেন ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কটনের অনুবাদের মার্জিত সংস্করণ বেরোয়। হ্যালিফাক্স কটন-সংস্করণে মঁতেন সম্পর্কে একটি মূল্যবান আলোচনা করেন। মঁতেন সম্পর্কে ইংরেজীতে এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। তারপর স্টুয়ার্ট, হ্যালাম, হ্যাজলিট প্রভৃতি সমালোচক ও ‘রেট্রোসপেক্‌টিভ্‌ রিভিউ,’ ‘ওয়েস্টমিন্‌স্টার রিভিউ’ প্রভৃতি পত্রিকা

মঁতেন সম্পর্কে গত শতকে আলোচনা করেন। এই সকল অনুবাদ ও আলোচনা প্রমাণ করে ইংরেজী প্রবন্ধসাহিত্যে মঁতেনের প্রভাব কত গুরুতর। সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকের ইংরেজী প্রবন্ধ-সাহিত্য ষোড়শ শতকের ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে ভিন্নতর, তা মনোযাগী পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। প্রবন্ধ যে স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম, প্রবন্ধরীতি যে নৈর্ব্যক্তিক নয়, তা যে ব্যক্তিচেতনায় উদ্ভাসিত হতে পারে, তার প্রমাণ প্রথম পাওয়া গেল মঁতেনে এবং তদনুসরণে ইংরেজী প্রবন্ধসাহিত্যে ; বেকন, ল্যাম, বীরবুম, হাডসন, ভের্ণন লী, কনরাড, লেস্‌লি ষ্টিফেন, হ্যাজলিট, চেষ্টারটন, উলফ, বাটলার তার প্রমাণ।

মঁতেনের কাছে প্রবন্ধশিল্পীরা কয়েকটি বিষয়ে ঋণী। প্রবন্ধ যে ব্যক্তিচেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হবে, তা যে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সুহৃৎসম্মিত সম্পর্ক স্থাপন করবে, তা যে বিষয়নির্ভর না হয়ে ভাবনিষ্ঠ হবে, বক্তব্যকে ছাড়িয়ে উঠবে প্রকাশরীতি এবং সর্বোপরি প্রবন্ধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টিতে পরিণত হবে, এই চেতনার মূলে আছেন মঁতেন। বাংলা প্রবন্ধরীতিতে যিনি পরিবর্তন ঘটালেন, সেই প্রমথ চৌধুরী এই মঁতেনেরই ভাবশিষ্য। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ।

মঁতেনের তিনখণ্ড প্রবন্ধাবলীতে এক সংসার-অভিজ্ঞ, বহুদর্শী, মানবচরিত্র নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত, পরিহাস-রসিক, ব্যঙ্গপ্রবণ বিদগ্ধ উদার পরিশীলিত রুচিবান ভদ্র জনের সাক্ষাৎ মেলে। কত বিচিত্র বিষয়ে তিনি লেখনী চালনা করেছেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। নির্বিশেষ জ্ঞানসাধনাই তাঁর জাবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তা পূর্বধৃত সংক্ষিপ্ত জীবনীতে দেখিয়েছি। প্রাচীন সংস্কৃতি ও বর্তমান জ্ঞানের রাজ্যে তাঁর অবাধ পরিভ্রমণ। কত বিষয়েই না তিনি লিখেছেন! দুঃখ, অনিদ্রা, সাধুতা, অনৃতভাষণ, আলস্য, পাণ্ডিত্য, বন্ধুত্ব, নির্জনতা, বার্ধক্য, মত্তাবস্থা, গন্ধ, গৌরব, ক্রোধ, সংসার-অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতা, গ্রন্থচর্চা, নামকরণ, প্রাচীন আদবকায়দা, বর্তমান ঠাট-ঠমক, কল্পনা, দর্শনচর্চা, বাক্যালাপ শিল্প, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, ভাল-মন্দ, নারী ও পুরুষ, রন্ধনবিদ্যা, ছলাকলা, ভীরুতা : হরেকরকম বিষয় নিয়ে মঁতেন লিখেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর মনটিকে প্রকাশ করেছেন।

প্রবন্ধাবলীর মুখবন্ধে (১২ই জুন, ১৫৮০) সেনর মঁতেন বলেছেন :

"This, reader, is a book without guile. It tells thee, at the very outset,. that I had no other end in putting it together but what was domestic and private. I had no regard therein either to thy service or my glory ; my powers are equal to no such design. It was intended for the particular use of my relations and friends, in order that, when they have lost me, which they must soon do, they may here find some traces of my quality and humour, and may thereby nourish a more entire and lovely recollection of me. Had I proposed to court the favour of the world, I had set myself out in borrowed beauties ; but 'twas my wish to be seen in my simple, natural and ordinary garb, without study or artifice, for 'twas myself I had to paint. My defects will appaear to the light, in all their native form, as far as consists with respect to the public. Had I been born among those naitons, who 'tis said, still live in the pleasant liberty of the law of nature, I assure thee I should readily have depicted myself at full length and quite naked. Thus, reader, thou perceivest I am myself the subject of my book ; 'tis not worth thy while to take up thy time longer with such a frivolous matter ; so fare thee well."

এই মুখবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এর মধ্য দিয়ে মঁতেনের চরিত্র ও মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাই। 'আমিই আমার গ্রন্থের বিষয়বস্তু'—দম্ভভরে এ কথা পাঠককে মঁতেনই প্রথম বলেছেন। আত্মীয় বন্ধুজনের প্রীত্যর্থে রচিত প্রবন্ধাবলীতে মঁতেন নিজস্ব অকৃত্রিম স্বভাবটিকে দেখাতে চেয়েছেন। জগদ্ধিতায় লোকহিতার্থে সাহিত্যচর্চার বাসনা তাঁর একেবারেই নেই।

একান্ত ব্যক্তিগত সুরের প্রাধান্য এই প্রবন্ধাবলীতে লক্ষ্য করি।

ইংরেজী প্রবন্ধসাহিত্যে এর অনুসৃতি দেখা যায় চার্লস ল্যামের প্রবন্ধে। অধুনা ব্যক্তিক নিবন্ধ বা 'পার্সোনাল এসে' বলতে আমরা যে সাহিত্যকৃতিকে বুঝি, তার মূল উৎস এখানেই। চেস্টারটন, লীকক, লিণ্ড, উলফ, বীরবুম, লেসলি ষ্টিফেন প্রমুখ ব্যক্তিক নিবন্ধকার মঁতেনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর বাংলা রম্যরচনা তার সাম্প্রতিক অতি তারল্য ও অগভীরতা সত্ত্বেও ল্যাম, লিণ্ড, চেস্টারটন এবং প্রমথ চৌধুরীর দ্বারা প্রভাবিত, তা অবশ্যস্বীকার্য। সস্মিত প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন মঁতেন, তাই লিণ্ড-কথিত দৃষ্টিভঙ্গী বা মানসিকতা ('a lucky dip into experience or into fantasy—often into both'), তাঁর যথার্থ বিবরণ, একথাও স্বীকার্য। মঁতেনের 'প্রবন্ধাবলী'তে খেয়ালী কল্পনার উচ্ছ্বাস ও অভিজ্ঞতার নির্যাস নিশ্চিতরূপে বর্তমান, এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

॥ ৪ ॥

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে অন্তরঙ্গ সুহৃৎসম্মিত ব্যক্তিগত আলাপনের সুরটি প্রাধান্য লাভ করেছে, এ সত্য মনোযোগী পাঠকের অজানা নয়। জগদ্ধিতায় লোক-কল্যাণে সাহিত্যচর্চায় মঁতেনের মত শিষ্য প্রমথনাথেরও কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। সাহিত্যকে কিণ্ডারগার্টেনে পরিণত করার তীব্র প্রতিবাদ তিনি করেছেন। আবার সামাজিক রীতিনীতিকে গুরুর অনুসরণে ব্যঙ্গের চাবুক মেরে সংশোধিত করতে চেয়েছেন। সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে মঁতেন তাঁর তিন খণ্ড 'প্রবন্ধাবলী'তে বিক্ষিপ্তভাবে যে-সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন, প্রমথ-প্রবন্ধে তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'প্রবন্ধাবলী'র প্রথম খণ্ডের ২৫ সংখ্যক প্রবন্ধে শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে মঁতেন যে মত ব্যক্ত করেছেন, প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' (বীরবলের হালখাতা) প্রবন্ধে অনুরূপ কথাই বলেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ১০ সংখ্যক প্রবন্ধে মঁতেন বইপড়া সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, বীরবল 'বইপড়া' (আমাদের শিক্ষা) প্রবন্ধে সে কথাই বলেছেন। 'প্রবন্ধাবলী'র পূর্বধৃত মুখবন্ধে মঁতেন যা বলেছেন, 'খেয়ালখাতা' (বীরবলের হালখাতা) প্রবন্ধে প্রমথনাথ তারই প্রতিধ্বনি করেছেন। বীরবল

বলেছেন, "আমাদের কাজের কথায় যখন কোন ফল ধরে না তখন বাজে' কথার ফুলের চাষ করলে হানি কি। যখন আমাদের ক্ষুধা-নিবৃত্তি করবার কোন উপায় করতে পারছি নে, তখন দিন থাকতে শখ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক।...খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদখেয়ালী লোকের কিছু কমতি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়ই অভাব।...আমার কথার ভাবেই বুঝতে পারছেন যে, আমি খেয়াল বিষয়ে একটু হালকা অঙ্গের জিনিসের পক্ষপাতী। চুটকিও আমার অতি আদরের সামগ্রী—যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢং ওস্তাদী হয়। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনাযুক্ত ছিবলেমি।" এই কথারই অনুস্মৃতি লক্ষ্য করি 'চুটকি' প্রবন্ধে ('বীরবলের হালখাতা')। আসলে মঁতেনের মত প্রমথ চৌধুরীও খেয়ালী লঘু কল্পনা এবং সামাজিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তার কারবারী ছিলেন। সেজন্যই প্রবন্ধ-সংগ্রহে যে প্রমথ চৌধুরীর দেখা পাই, তিনি মঁতেনের মতই একজন বহুদর্শী অভিজ্ঞ পরিহাসরসিক বিদগ্ধ রুচিবান ব্যঙ্গপ্রবণ উদার-হৃদয় সামাজিক।

মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে এই সাযুজ্য মঁতেনের ভাবশিষ্যরূপে প্রমথ চৌধুরীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং একটি নবতর প্রবন্ধরীতি প্রবর্তনে সহায়তা করেছে। 'বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ' ও 'তরজমা' (বীরবলের হালখাতা), 'সবুজপত্রের মুখপত্র', 'নূতন ও পুরাতন', 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' ও 'ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' (নানাকথা) প্রবন্ধগুলি, বিশেষতঃ শেষোক্তটি প্রমথ চৌধুরীর মানসপ্রবণতা কোন্‌দিকে, তার সাক্ষ্য দেয়। মঁতেনের জীবনদর্শন ও প্রবন্ধরীতি—উভয়ই প্রমথ চৌধুরী আত্মসাৎ করে বাংলা সাহিত্যে তাঁর খেয়ালখাতা খুলেছিলেন, এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য। প্রমথ চৌধুরী বাংলা প্রবন্ধরাজ্যে প্রথম, যিনি বলেছেন, 'I am myself the subject of my book।' সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের ব্যক্তিচেতনায় উদ্ভাসিত মননশীল যুক্তিশৃঙ্খলাযুক্ত পরিচ্ছন্ন রূপের আদি কাঠামো প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ। ফরাসীরা বলেন, 'যে বস্তু স্বচ্ছ (ক্ল্যার) নয় তা ফরাসী নয়।' প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধ-রীতির মধ্য দিয়ে এই কথাই প্রচার করেছেন। সারল্য, স্বচ্ছতা, প্রাঞ্জলতা, আলো: প্রমথ চৌধুরীর আরাধ্য বস্তু এবং প্রমথ চৌধুরীর

'প্রবন্ধ-সংগ্রহে' তার অভাব নেই।

জনৈক ইউরোপীয় সাহিত্যিক বলেছেন, "তুতম্ আ দ্যু পাত্রি—লা সিয়েন, এ পুই লা ফ্রাঁস।" অর্থাৎ মানুষ মাত্রেরই দুটি মাতৃভূমি; একটি তার নিজস্ব, অপরটি ফ্রান্স। এই কথা বাংলা সাহিত্যে যদি কেউ আপন সাহিত্যসাধনায় দেখিয়ে থাকেন, সে ব্যক্তি বীরবল ওরফে প্রমথ চৌধুরী। বীরবলী প্রবন্ধরীতি তাঁর অন্যতম পরিচয়স্থল।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শ

সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় 'সবুজপত্রের মুখপত্র' প্রবন্ধে 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' বলে প্রমথ চৌধুরী প্রাণকে বন্দনা করেন এবং এই প্রাণের, তারুণ্যের, যৌবনের উপাসনাই সবুজপত্রের সাধনা, একথা ঘোষণা করেন। তিনি আরো বলেছেনঃ "প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই জড়তা প্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়;—বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণিজগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্ম জগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক—প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস।" ('যৌবনে দাও রাজটিকা')।

এই মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠাই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য ছিল, একথা বলা যেতে পারে। মানসিক যৌবন ক্ষণস্থায়ী ও সংকীর্ণ নয়, তা ব্যাপক, উদার ও চিরস্থায়ী। মানসিক যৌবন কখনোই পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকে না; সাহিত্যক্ষেত্রে চৌধুরী মহাশয় কখনো পুরাতনকে আঁকড়ে থাকতে চান নি। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শে যে নবীনত্ব, বিদ্রোহ ও অগ্রগতি লক্ষ্য করি, তা এই মানসিক যৌবনের চর্চার ফলমাত্র। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, সেখানে অন্ধকার গর্ভগৃহ নেই, সবুজের আবাহন আছে। "আমাদের নব-মন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে।" ('সবুজপত্র')। এই ভরসা নিয়ে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যলোক তাই প্রাণের রঙীন আলোয় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্যসাধনার প্রাপ্তি সম্পর্কে তাঁর কোনোরূপ

মোহ ছিল না। সাহিত্যসাধনা যে জীবনসাধনারই একটি দিক এবং তা যে আসলে প্রাণের—যৌবনের সাধনা, তা তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন। তিনি রূপসাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত করেছিলেন; জীবনের সর্বত্র রূপানুসন্ধানেই তিনি আনন্দ পেতেন। তার পরিচয় 'রূপেরকথা' প্রবন্ধটি। কামলোক থেকে রূপলোকে উত্তীর্ণ হওয়াটাই জীবনের কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। ইন্দ্রিয়ের জগতে যে বস্তুরূপ, প্রমথ চৌধুরী তার থেকেই শিল্পানন্দ আহরণ করতে চেয়েছেন। "রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্য সমাজেব গোড়ার কথা হলেও, সুরুচি তার শেষ কথা। শিব সমাজের ভিত্তি, সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।" ('রূপের কথা')। মনের দারিদ্র্যই আমাদের রূপান্ধ করেছে, এজন্য তাঁর আফশোষের অন্ত নেই। সাহিত্যে এই বস্তুগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়লোকের রূপকেই তিনি চেয়েছেন, কেননা তাঁর ধারণা, "আমবা সব জন্মতঃ কামলোকের অধিবাসী; সুতরাং রূপলোকে যাওযার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।" প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যসাধনা এই রূপলোকে উত্তবণেব সাধনা। একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, "আমি কৈশোর উত্তীর্ণ না হতে হতেই টের পেযেছিলুম যে, জাবনে কোন্ কোন্ জিনিষ আমাকে অধিকাব করে নেবে—beauty, mind—এবং এটাও বুঝতে বাকি ছিল না যে আমার মনোজগতেব কেন্দ্র হবে The Eternal Feminine—তবে তখন বিশ্বাস ছিল যে সাহিত্যজগতেই ঐ তিনটি জিনিষ পাব—এবং realise করব।" (দ্রঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বষ, ৪থ সংখ্যা)।

প্রমথ-মানসেব যে পরিচয আমবা এখানে পাই, তা থেকে তাব সাহিত্যসাধনাব প্রবৃত্তি কোন্ দিকে তা বুঝতে পারি। এখন ভবসা করে তাঁব সাহিত্যাদর্শেব আলোচনায প্রবৃত্ত হওযা যেতে পাবে।

॥ ২ ॥

সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য কী, এ বিষযে প্রমথ চৌধুরী তাঁর অভিমত স্পষ্ট ভাষায ব্যক্ত করেছেন। সমাজকল্যাণ বা লোকশিক্ষার জন্য সাহিত্যসৃষ্টিতে তাব সায নেই। তিনি মনে কবেন, "সাহিত্যের

উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। ···সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলা দেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক—এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্য রাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না।" ('সাহিত্যে খেলা')। তাই 'সাহিত্যে পাঠকের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা' করার অর্থ লেখকের ধর্মচ্যুতি, এই তাঁর সিদ্ধান্ত।

বিগত শতকে বঙ্কিমচন্দ্র 'নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' উপস্থিত করে বলেছিলেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" ('প্রচার', ১২৯১ মাঘ)। প্রমথ চৌধুরী সৌন্দর্যসৃষ্টির তত্ত্বে বিশ্বাসী, মঙ্গলব্রতে তাঁর পুরা অবিশ্বাস। বিপরীত দিকে জোর দিয়ে বলেছেন, সাহিত্য ও শিক্ষা এক বস্তু নয়; "শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মনকে জাগানো" ('সাহিত্যে খেলা')। সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা, শিক্ষা দান করা নয়, এখানেই তিনি বিগত যুগের সাহিত্যনায়কের পথ থেকে সরে এসেছেন। বঙ্কিম-প্রবন্ধ ও প্রমথ-প্রবন্ধের চরিত্র আলোচনা করলেই এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্কিম-প্রবন্ধ সমাজ কল্যাণাদর্শে অনুপ্রাণিত, প্রমথ-প্রবন্ধ নির্বিশেষ সংস্কৃতিসাধনায় নিযুক্ত। একের মূল ভিত্তি সমষ্টিচেতনা, কল্যাণমুখিতা, আদর্শবাদিতা, ভাবোচ্ছ্বাস, অপরের ব্যক্তিচেতনা, বিশ্বমানবিকতা, দৃঢ় প্রকৃতিস্থতা, বুদ্ধির মুক্তি ও ভাবালুতামুক্তি। আনন্দ সৃষ্টি ও পরিবেশনই সাহিত্য সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য, চৌধুরী মহাশয়ের এই-ই সুদৃঢ় অভিমত। সাহিত্য কি খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, "সরস্বতীকে কিণ্ডার গার্টেনের শিক্ষয়িত্রীতে পরিণত করবার জন্য যতদূর শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার, আমি আজও ততদূর হতে পারি নি।" ('সাহিত্যে খেলা')।

চৌধুরী মহাশয় তাঁর সাহিত্যজীবনে যে কেবল বুদ্ধির মুক্তিসাধনায়

নিজেকে ব্যাপৃত করেছিলেন, তা নয়, বিশ্বমানবিকতার সাধনা ও দেশকালগণ্ডিমুক্ত সাহিত্যপ্রভাবকে আত্মস্বীকৃতি দানের সাধনাও করেছিলেন। কি সমাজে, কি সাহিত্যে তিনি প্রাচীন ও নবীন কোনো সংস্কারকেই প্রাধান্য দিতে রাজি হননি। সংস্কারের অন্ধতা ও মোহের পিছুটান থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াস তাঁর রচনায় সর্বত্র বর্তমান।

মনের জগতে তিনি কোন বাধাকেই স্বীকার করেন নি। "স্বদেশের ক্ষেত্রেও যে বিদেশী ফুলের আবাদ করা যায়, তার প্রমাণ স্বয়ং গোলাপ। পারস্য দেশের ফুল আজ ভারতবর্ষের ফুলের রাজ্যে গৌরব ও সৌরভের সহিত নবাবি করছে। বহির্জগতে যদি এক ক্ষেত্রে নানা ফুল ফোটে, তাহলে মনোজগতের যে-কোনো ক্ষেত্রে অসংখ্য বিভিন্ন জাতীয় ফুল ফোটবার কথা। কেননা, খুব সম্ভব মনোজগতের ভূগোল আমাদের পরিচিত ভূগোলের অনুরূপ নয়। সে জগতে দেশভেদ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে অন্ততঃ অলঙ্ঘ্য পাহাড় পর্বতের ব্যবধান নেই, এবং মানুষের হাতে গড়া সে রাজ্যের সীমান্ত-দুর্গ সকল এ যুগে নিত্য ভেঙ্গে পড়েছে। ভাবের বীজ হাওয়ায় ওড়ে এবং সকল দেশেই অনুকূল মনের ভিতর সমান অঙ্কুরিত হয়।" ('বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি')।

এই মনের মুক্তিবায়ু প্রমথ চৌধুরী নিজেই বাংলা সাহিত্য এনেছিলেন। ফরাসি সাহিত্যের তীক্ষ্ণ তীব্র রসিকতা ও জীবনদর্শন বাংলা সাহিত্যে তিনিই আমদানি করেন। এবং তা আমাদের মনকে সংস্কার-মোহের অন্ধ আনুগত্য থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে।

যিনি সাহিত্যিক, তিনি সমাজের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য নন। যিনি যথার্থ সাহিত্যিক তিনি মনের ক্ষেত্রে মুক্ত, স্বাধীন। "যাঁর স্বাধীনতা নেই, তাঁর সাহিত্যে কোন কিছুরই সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই। তিনি বড়জোর বিশ্বের রিপোর্টার হতে পারেন, তার বেশী নয়। ধর্মপ্রবর্তক কবি আর্টিষ্ট প্রভৃতিই মানবের যথার্থ শিক্ষক, কেননা তাঁরাই মানব সমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন। এই কারণে যিনি যথার্থ কবি তিনি সমাজের ফরমায়েশ খাটতে পারেন না।" ('বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি')।

তবে কি সাহিত্যিক যুগধর্মের অধীন? প্রমথ চৌধুরী এই প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। "যুগধর্ম প্রকাশ করাই সাহিত্যের চরম

সাধনা, এ কথা সত্য নয়। তার কারণ প্রথমতঃ যুগধর্ম বলে কোন যুগের একটী মাত্র বিশেষ ধর্ম নেই। একই যুগে নানা পরস্পর বিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ মন-পদার্থটি কোনো বিশেষ কাল সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে না। আত্মা এক অংশে কালের অধীন, অপর অংশে মুক্ত ও স্বাধীন। কাব্য ধর্ম আর্ট প্রভৃতি মুক্ত আত্মারই লীলা। সুতরাং ইতিহাস এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, প্রতি যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে সমসাময়িক যুগধর্ম পরীক্ষিত ও বিচারিত হয়েছে।" তাই সাহিত্যিক কোন বিশেষ যুগধর্মের দাসত্ব করতে পারে না। যে ধর্ম সকল যুগে বর্তমান, সেই নিত্য নব যুগধর্মেরই তিনি প্রবক্তা। "নব যুগধর্ম আনয়ন করা যদি সাহিত্যের চরম সাধনা হয়, তাহলে সাহিত্য বর্তমান যুগধর্ম অতিক্রম করতে বাধ্য।" ('বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি')। সাহিত্য নিত্য বস্তু। তাই লেখকের সিদ্ধান্ত, "কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ।... The light that never was on land or sea, সেই আলোকে বিশ্বদর্শন করবার শক্তিকেই আমরা কবিপ্রতিভা বলি, কেননা সে জ্যোতি বাহ্যজগতে নেই, অন্তর্জগতেই তা আবির্ভূত হয়।" (তদেব)

সাহিত্যে তিনি কখনো সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেন নি। বস্তুতঃ তাঁর সাহিত্যসাধনার মূল লক্ষ্যই ছিল তাই। সৎ সাহিত্য-সাধনার ফলশ্রুতি, মনের মুক্তি, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ মাত্র ছিল না। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, "একমাত্র সাহিত্যই এ পৃথিবীতে মানবমনের সকল প্রকার সংকীর্ণতার জাতশত্রু। জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ্বালো না কেন, তাহার আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে; ভাবের ফুল যেখানেই ফুটুক না কেন, তাহার গন্ধ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। মনোজগতে বাতি জ্বালানো এবং ফুল ফোটানোই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম এবং একমাত্র কর্ম। কোন জাতির মনের ঐক্য সাধনের প্রধান উপায় সাহিত্য কেননা ভাষার ঐক্যই জাতীয় ঐক্যের মূল। ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র হতে পারে, কিন্তু বাঙালী যে একটি বিশিষ্ট জাতি তাহার কারণ, এক-ভাষার বন্ধনে এ দেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, ব্রাহ্মণ শূদ্র হিন্দু মুসলমান সকলেই আবদ্ধ। সকল প্রকার স্বার্থের বন্ধনের অপেক্ষা ভাষার বন্ধন দৃঢ়। এ বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি কাহারও নাই, কেন না ভাষা অশরীরী। শব্দ বহির্জগতে

ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মনোজগতে চিরস্থায়ী। এই চিরস্থায়ী ভিত্তির উপরই আমরা সরস্বতীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করি।" ('অভিভাষণ')

সাহিত্য যে সকল প্রকার সংকীর্ণতার জাতশত্রু, তার প্রমাণ প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য। ফরাসী, ইতালীয়, পারসিক এবং ভারতীয—প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের প্রভাব তাঁর সাহিত্যে সহজেই আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু সে প্রভাব ঋণ গ্রহণ নয়, আত্মসাতের নৈপুণ্য। মনো-জগতের পথে পথে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার; সে জগতে তিনি পেত্রার্কা ও ওমর খৈয়াম, ভাস ও ভারতচন্দ্র, মঁতেন ও গ্যয়টে, আনাতোল ফ্রাঁস ও শূদ্রক, ফ্লবেঅর ও বার্ণার্ড শ, রেণাঁ ও উগোর সহযাত্রী।

॥ ৩ ॥

সাহিত্যে কোনো সংকীর্ণতা ও বাধার প্রশ্রয প্রমথ চৌধুরী দিতে রাজি নয়, তা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। তাঁর মুক্ত মনের পরিচয আরো পাই, সাহিত্যে নীতি বনাম অশ্লীলতা প্রসঙ্গে। এ বিষয়ে তিনি তাঁর মত স্পষ্ট ভাষায প্রকাশ করেছেন পাঁচটি প্রবন্ধে: 'জয়দেব', 'ভারতচন্দ্র', 'চিত্রাঙ্গদা', 'কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত' ও যৌবনে দাও রাজটীকা'। এই ক্ষেত্রে স্মর্তব্য ফরাসী সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক প্রমথ চৌধুরীর অশ্লীলতা সম্পর্কে কোন রকম শুচিবায়ু ছিল না।

'জয়দেব' ও 'ভারতচন্দ্র' এ দুটি প্রবন্ধে তিনি স্বীকাব করেছেন, এঁরা দুজন সব সময় শ্লীলতার গণ্ডী রক্ষা কবেন নি। কিন্তু তিনি জয়দেবের তীব্র নিন্দা ও ভারতচন্দ্রেব উচ্চ প্রশংসা করেছেন। জয়দেব যে কামলোকের কবি, রূপলোকের কবি নন, তা উক্ত প্রবন্ধে চৌধুরী মহাশয় দেখিয়েছেন। গীতগোবিন্দ যে কেবল 'বিলাসকলাকুতূহল' কথা, সে কাব্যে যে কেবল দেহসর্বস্ব নির্লজ্জা রাধিকাপ্রমুখ গোপযুবতাদের বর্ণনা আছে এবং সেখানে যে রমণীর রূপবর্ণনার অভাব ও কাম-বর্ণনার প্রাবল্য, তাই চৌধুরী মহাশয়কে জয়দেবের প্রতি বিমুখ করেছে। আর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে দেখি আর্টিষ্ট ভারতচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা। "ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে, অপরের কাছে শুধু nature"।

জয়দেব সেই অপর কবি, তাই তিনি নিন্দিত। জীবনের সকল দুঃখযন্ত্রণা, দৈবদুর্বিপাক, দারিদ্র্য ভারতচন্দ্রকে নিরানন্দ করতে পারে নি, করেছিল শুধু 'প্রমোদের প্রভু'। "এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিষ্টের মন সকল দেশই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিনকালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়।" এই দুই প্রবন্ধে দেখি, চৌধুরী মহাশয় আর্টকে সব-কিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। হীরা মালিনী ও সুন্দর কামলোকের নয়, রূপলোকের অধিবাসী। আর জয়দেবের রাধা কামলোকের অধিবাসিনী। এজন্যই প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের ভক্ত ও জয়দেবের প্রতি বিমুখ।

জয়দেবকে ভর্ৎসনা করে তিনি বলেছেন, জয়দেবের কাব্যে ভাবের সৌন্দর্য নেই, আছে দেহজ কামনা-বাসনার বর্ণনা। সেজন্য তা আমাদের মনে রসের উদ্রেক করে না, লালসা উদ্দীপ্ত করে। কোনো সৎ কবি এ কাজ করেন না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য কাব্যে অবশ্যই থাকবে, কিন্তু তা যেন ভাবের সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রকাশ পায়, এই তাঁর বক্তব্য। জয়দেবে এই আশা পূর্ণ হয় নি, এজন্যই চৌধুরী মহাশয়ের ভর্ৎসনা।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের দুটি গুণ প্রমথ চৌধুরী আবিষ্কার করেছিলেন; এতে আছে প্রসাদ গুণ এবং তা রসাল। এই শেষোক্ত বিষয়েই নীতিবাগীশদের আপত্তি। ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা আছে, কিন্তু তাতে আছে আর্ট, তা নেচারের প্রতিফলন নয়; এবং তা সহাস্য। ভারতচন্দ্রকে এখানে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "হাস্যরস যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় আরিস্টোফেনিস থেকে আনাতোল ফ্রাঁস পর্যন্ত সকল হাস্যরসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিসটেই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।" এখানেই ভারতচন্দ্র সার্থক শিল্পী।

সংস্কৃত কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে সাহিত্য নীতি ও রুচির প্রশ্ন প্রমথ চৌধুরী আরেকবার উত্থাপন করেছেন। সেখানে তাঁর আপত্তি সংস্কৃত কাব্যের যৌবনবন্দনায় নয়, এই বন্দনার একঘেয়েমি ও বাড়াবাড়িতে। এই বাড়াবাড়ি অর্থাৎ

যৌবনের স্থূল শরীরকে সংস্কৃত কাব্যে এত বেশি আশ্‌কারা দেওয়া হয়েছিল যে শেষের দিকে সংস্কৃত কাব্যের অবনতির সময়ে কাব্য স্থূল দেহসর্বস্ব হয়ে উঠেছিল এবং ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহমনের পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। প্রমথ চৌধুরীর আপত্তি এখানেই। তিনি চান মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠা এবং সে সাধনাতেই তিনি ব্যাপৃত হতে চেয়েছেন। এতো কথার পর তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, "কেউ মনে করবেন না যে, আমি কাউকে সংস্কৃত কাব্য বয়কট করতে বলছি কিংবা নীতি এবং রুচির দোহাই দিয়ে সে কাব্যের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়। সংস্কৃত কাব্যে যে যৌবন-ধর্মের বর্ণনা আছে তা যে সামান্য মানবধর্ম, এ হচ্ছে অতি স্পষ্ট সত্য; এবং মানবজীবনের উপর তার প্রভাব যে অতি প্রবল তাও অস্বীকার করবার জো নেই।" যৌবনকে অধুনা আমাদের দেশে দমিয়ে দেবার যে চেষ্টা সমাজপিতারা করেছেন, চৌধুরী মহাশয় তার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন, এর ফলে আমাদের সামাজিক জীবন শক্তি ও আনন্দহীন হয়ে অকালবার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। সাহিত্যে এর ফল হয়েছে—অস্বাভাবিকতা; "সাহিত্যক্ষেত্রে একদিকে স্কুলবয়, অপর-দিকে স্কুল মাষ্টার"—এ দুয়েতেই তাঁর আপত্তি।

সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নতে কখনো গুরুত্ব দিতে রাজি হন নি। আর্টের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিই তাঁর কাছে বড় কথা। এই প্রশ্নটি তিনি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন 'কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত' প্রবন্ধে। তাঁর মতে, "শ্লীলতা-অশ্লীলতা সুরুচির কথা, সুনীতির কথা নয়"। সাহিত্যে নীতির প্রশ্ন অবান্তর বলেই তিনি মনে করেন। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে অশ্লীলতাকে অবশ্যই দোষ বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে অশ্লীলতার অর্থ গ্রাম্য বা indecent; এ হল দণ্ডীর মত। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে "অশ্লীলতা-দোষ হচ্ছে কাব্য-দেহের দোষ, অপর কোনো বস্তুর নয়। তাঁদের বিচার পোয়েটিক্‌স্‌-এর অন্তর্ভূত, এথিকস্‌-এর নয়"। বামন প্রমুখ আলংকারিকরা বলেন, গ্রাম্যতা হচ্ছে শব্দের দোষ। শব্দ ব্যবহারে দুষ্টতা বা গ্রাম্যতাই অশ্লীলতা। বামনের এই কথাটি অলংকার শাস্ত্রের শেষ কথা বলে

প্রমথ চৌধুরী মনে করেন—"ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী''—যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল। সামাজিক অর্থাৎ কালচার্ড লোকের মনে যদি লজ্জা বা ঘৃণার ভাব জন্মে, তবে তার উৎস যে রচনা, তা অশ্লীল। সুতরাং সভ্য সহৃদয় কাব্যরসিক সামাজিকদের প্রীতিপদ রচনাই শ্লীল রচনা। এর পরে আর কোনো কথা নেই বলে চৌধুরী মহাশয় মনে করেন। আর "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা'' কথাটি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক বলেই মনে হয়েছে, কেননা যারা এই কথা প্রচার করেন, তাঁরা আসলে চান সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা অর্থাৎ সমাজের স্থিতাবস্থা রক্ষা। এই শ্রেণীর রক্ষণশীল নীতিবাগীশদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই। "কাব্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে সংস্কৃত আলংকারিকরা ছিলেন beautyর অনুরক্ত, আমরা হয়েছি utilityর ভক্ত।" তাই আমাদের রসজ্ঞান ও কাব্য-বিচারবোধ নানা অ-সাহিত্যিক প্রশ্নের পিছুটানে আবদ্ধ। আমরা যদি সভ্য সহৃদয় কাব্যরসিক সামাজিক অর্থাৎ কালচার্ড হয়ে উঠতে পারি, তবেই আমরা সংস্কৃত আলংকারিকদের মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ফিরে পাব, এই তাঁর বক্তব্য। আর আমরা যে নীতি ও মর‍্যালিটি নিয়ে মাথা ঘামাই, তার কারণ আমরা ইংরেজিশিক্ষিত। যদি ফরাসির কাছে পাঠ নিতুম, তবে নীতিবিচার ছেড়ে দিয়ে এস্থেটিক ইমোশনকেই আমল দিতুম বলে প্রমথ চৌধুরা মনে করেন।

শুধু মনে করা নয়, কাজেও তিনি তা দেখিয়েছেন 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধে। তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সমালোচনা। এখানে তিনি বলেছেন; "বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে কামলোকের উপরে রূপলোক বলে আর-একটি লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপলোকের বস্তু কামলোকের নয়, তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যাঁদের তা নেই, অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ, তাদের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।" এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ রূপলোক সৃষ্টি করেছেন এবং চিত্রাঙ্গদা সেই রূপলোকের প্রতিমা, সে রূপলোকের real। জয়দেব তা পারেননি বলেই ব্যর্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যে কোন নীতি-

বোধের দ্বারা চালিত হন নি, সাহিত্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চিত্রাঙ্গদা-রূপ 'যৌবনস্বপ্নের অপূর্ব সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র' অংকন করেছেন, এটাই তাঁর প্রতিপাদ্য। পূর্বধৃত প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, কাব্যালোচনায় beautyর ঠাঁই আছে, সাংসারিক utilityর সেখানে নিরর্থক। এখানে বলেছেন, "মানবমনের প্রীতিসাধনই কাব্যের একমাত্র utility"। আর সে প্রীতিসাধনে চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সাফল্য তর্কাতীত। এখানে সাংসারিক প্রয়োজন ও সার্থকতার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর।

টমসন সাহেব চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিলেন। সুকঠিন তীক্ষ্ণাগ্র বিদ্রূপাস্ত্রে টমসন সাহেবের যুক্তি ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে প্রমথ চৌধুরী এখানে প্রমাণ করেছেন যে আর্টের ক্ষেত্রে নীতি বা মর‍্যালিটির প্রশ্ন অবান্তর ও অ-সাহিত্যিক। "কাব্যের আবেদন মানুষের moral senseএর কাছে নয়, spiritual senseএর কাছে"। এটি যারা ধরতে পারেন না, তাঁরাই অরসিক মনের পরিচয় দিয়ে থাকেন, যেমন দিয়েছেন টমসন সাহেব। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের ভাবসৌন্দর্য ও বাণীলাবণ্য যে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে, তার সাফল্য সেইখানেই নিহিত আছে। "জীবনে যা ক্ষণিকের, তাকেই মনোজগতে চিরদিনের করবার কৌশলের নামই আর্ট"। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের মর্মকথা, একটি ক্ষণমুহূর্তকে অনন্ত মুহূর্তে পরিণত করার সাধনা।

মদন চিত্রাঙ্গদাকে বলেছিলেন—

আমিই চেতন করে দিই
একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।

এই কাব্য এই শুভ পুণ্যক্ষণের কল্পনা, এখানেই তার যাত্রা শুরু। কবিপ্রতিভাবলে এ পুণ্যক্ষণ একটি অনন্ত মুহূর্তে পরিণত হয়েছে।

বসন্ত বলেছেন—

একটী প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন

আর মদন বলেছেন—

সংগীতে যেমন, ক্ষণিকের
তানে, গুঞ্জরি কাঁদিয়া ওঠে অন্তহীন
কথা।

তার ফলে 'মানুষের যৌবনস্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর real চিত্র' আমরা পেয়েছি। অমরতার স্পর্শ লাভ করে রূপলোকের লাবণ্য-প্রতিমা চিত্রাঙ্গদা যখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন দেখি—

উষার কনক মেঘ দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায় পূর্বপর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্য
সুখাবেশে।

টমসন সাহেবের খৃষ্টীয় নীতিবোধে নয়, সহৃদয় কাব্যরসিক সামাজিকের দৃষ্টিতে চিত্রাঙ্গদার অপূর্ব সৌন্দর্য ধরা দেয়, এই-ই প্রমথ চৌধুরীর সিদ্ধান্ত।

॥ ৪ ॥

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেগুলিতে উপরোক্ত সাহিত্যাদর্শের প্রতিফলন লক্ষ্য করি। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে 'মলাট সমালোচনা', 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ', 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য', 'শিশুসাহিত্য'।

বর্তমান কালের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী যে চিন্তা করেছেন, তা মৌলিকত্বে ও পথনির্দেশে উল্লেখযোগ্য। রক্ষণশীলেরা যেখানে বর্তমান বাংলা সাহিত্যকে নিন্দা করেছেন, সেখানে তিনি তাকে সমর্থন করেছেন। এই সমর্থনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাড়ে যদি আমরা মনে রাখি 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' ও 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' এ দুটি প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯১৩-১৫ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-উত্তরার নবসাহিত্য-আন্দোলনের দশ বছর পূর্বে। 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' প্রবন্ধে তিনি এর চরিত্রবিচার এবং প্রয়োজনমত সমালোচনা করেন। আর 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি সমকালীন বিরোধী সমালোচনার হাত থেকে একে রক্ষা করার জন্য কলম ধরেন। বিশ শতকের প্রথম পাদের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মমতা ও সমর্থন, সমালোচনা ও ত্রুটিনির্দেশ পরবর্তীকালের বিচারে অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে, এখানেই এ দুটি প্রবন্ধের সার্থকতা।

নবযুগের ধর্ম বলতে তিনি বুঝেছিলেন, 'মানুষের সহিত মানুষের মিলন ঘটানো, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ করা; কাউকে ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়'। নব সাহিত্য এই ধর্মের পোষকতা করে বলেই তা 'রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন' করেছে। 'বহুশক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকদের দিন চলে গিয়ে স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকদের দিন আসছে'। কিন্তু এর ত্রুটিও আছে, যেমন গণধর্মের ঝোঁক পড়েছে বৈশধর্মের দিকে এবং কেবল মাসিকপত্রের প্রাচুর্য নয়, সচিত্র মাসিকপত্র প্রাধান্য লাভ করেছে। 'যেন-তেন-প্রকারেণ বিকিয়ে যাবার প্রবৃত্তি', এবং ছবি ফাউ দিয়ে মেকি মাল বাজারে কাটানোর ব্যগ্রতায় সাহিত্যধর্মের বিচ্যুতি লক্ষ্য করে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। সাহিত্য যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তা যে আপন মর্যাদায় দাঁড়াতে পারে, সেখানে যে লোভের চেয়ে দারিদ্র্যের মূল্য অধিক, একথা তিনি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' প্রবন্ধে। সাহিত্যের চরিত্র ও বিশুদ্ধি রক্ষায় ব্যাকুল প্রমথ-মানসের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

এ প্রবন্ধে তিনি আরেকটি গুরুতর প্রশ্নের আলোচনা করেছেন: আজকের সাহিত্যিকের কর্তব্য কি? তাঁর দুঃখ এই যে সাম্প্রতিক লেখা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়, গালভরা ফাঁপা বুলি তিনি চান না, তাঁর দাবি, 'সাহিত্যে কস (grip) থাকা আবশ্যক'। অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না'— এ তিনি বিশ্বাস করতেন। কাব্যের উদ্দেশ্যে 'ভাব প্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা'। এজন্য লেখককে হতে হবে পরের মনোবীণা, নিজের নয়। 'বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসন' লেখকের পক্ষে অত্যাবশ্যক, এই সংযম-তত্ত্বটি প্রমথ চৌধুরী প্রতিপন্ন করেছেন। এবং সেই সঙ্গে সতর্কবাণী—চাই সতর্ক সাধনা, শৈথিল্যহীন বিচারবুদ্ধি ও বহুকর্ষিত বিদ্যা; 'অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা যে এক জিনিস নয়', তা নোতুন লেখকদের শিখতে হবে।

'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি এই সাম্প্রতিক সাহিত্য ও নোতুন লেখকদের হয়ে বিরোধীদের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করেছেন এবং

এতে তাঁর নবীন-সাহিত্য-প্রীতিই প্রকাশ পেয়েছে। যে সব বাঙালি সমালোচক উনিশ শতকের সমাজ-সাহিত্য-প্রেমে অন্ধ, তাঁদের তীব্র ব্যঙ্গ তিনি করেছেন। এঁদের অভিযোগ নবসাহিত্যের বিরুদ্ধে: তার সর্বত্র বন্ধ্যাদশা; সমালোচনাসর্বস্ব এই নব সাহিত্যের এখন অন্তিমদশা; এ সাহিত্য এখন বহুফসলী, শস্তা, বিশেষত্বহীন, প্রতিভাহীন, চুটকিসর্বস্ব এবং নকল মাত্র। প্রমথ চৌধুরী এ সব অভিযোগ খণ্ডন করে একে নিজ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চৌধুরী মহাশয়ের মতে, অতীত অপেক্ষা বর্তমান ঢের বেশী মূল্যবান। ইভলিউশন ভবিষ্যৎমুখী। বর্তমানের প্রবাহে জাতি ও সাহিত্যের জঙ্গম রূপটি ধরা পড়ে। অতীত চর্চায় মানসিক ঔদার্য নেই, আছে গুরুবাক্যের নির্বিচার পালন। সাম্প্রতিক বঙ্গসাহিত্যে যে বহুবিস্তার ও বৈচিত্র্য, বহুজনসমাগম ও কলরব, স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব, রুচি ও ভাবের নব নব রূপ লক্ষ্য করা যায়, তা অভিনন্দনযোগ্য এই কারণে যে, এখানে নবীন প্রাণের ও যৌবনের পরিচয় রয়েছে। একদিন যোগ্যতরের উর্ধতন ঘটবে, সেদিনের আশায় আজকের অতিফসল সমর্থনীয়। উনিশ শতকের নবজাগরণের জোয়ারে আজ বিশ শতকের প্রথম পাদে ভাঁটার টান ধরেছে, এটি প্রমথ চৌধুরীর অতন্দ্র সাহিত্যবোধের দ্বারা অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি রচনার নাতিদীর্ঘতা, বহু লেখকের সমাগম, গদ্যের বহুচর্চা, ছোট গল্পের প্রাধান্য, কাব্যদেহের পরিবর্তন, উনিশ শতকী সাহিত্যগুরুদের প্রাধান্য লোপ প্রভৃতিকে যুগলক্ষণ বলে মেনে নিয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথের অতিবিস্তৃত অপ্রতিহত প্রভাব যে আমাদের পক্ষে প্রয়োজন, তা ঘোষণা করেছেন। বিশ শতকের মধ্যবিন্দু উত্তীর্ণ হয়ে আজ আমরা চৌধুরী মহাশয়ের এই বিশ্লষণকে মোটামুটি সঠিক বলে মেনে নিতে পারি। এই চরিত্রবিশ্লেষণ প্রমথ চৌধুরীর মানসিক ঔদার্য ও সাহসের পরিচায়ক।

'মলাট সমালোচনা' ও 'শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধ দুটিতে পরিহাসচ্ছলে গুটি কয়েক home-truth তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। এ দুটি প্রবন্ধের বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তা আজো ফুরিয়ে যায় নি। পুস্তকের বহিরঙ্গ-প্রসাধন-বৈচিত্র্য ও আড়ম্বর, সমালোচনার নামে অতিনিন্দা ও অতিপ্রশংসা, প্রশংসাচ্ছলে মাত্রাতিরিক্ত আলোচনা, অচল সাহিত্যকে প্রাণপণে সচল

করার জন্য বণিকবৃত্তি অবলম্বন অর্থাৎ অতি-বিজ্ঞাপিত ও মিথ্যা-বিজ্ঞাপিত করার প্রাণান্তকর প্রয়াস, পুস্তকের নামকরণে উদ্ভট মৌলিকতা, অপ্রচলিত ও দুরূহ সংস্কৃত শব্দ-প্রয়োগে হাস্যকর ব্যগ্রতা : এ সবই প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এবং প্রথম প্রবন্ধটিতে এ সব দোষের উপর ব্যঙ্গের নির্মম চাবুক মেরেছেন। শেষে তাঁর তীক্ষ্ণাগ্র মন্তব্য : "ন্যাকামির উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজে লোকপ্রিয় হওয়া এবং তার লক্ষণ হচ্ছে ভাবে ও ভাষায় মাধুর্যের ভান ও ভঙ্গি। বঙ্গসাহিত্যে ক্রমে যে তাই প্রশ্রয় পাচ্ছে, সেইটে দেখিয়ে দেবার জন্য আমার এত কথা বলা। লেখকেরা যদি ভাষাকে সুকুমার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকে সুস্থ এবং সবল করবার চেষ্টা করেন, তাহলে বঙ্গসাহিত্যে আবার প্রাণ দেখা দেবে।" পুস্তকের বহিরঙ্গপ্রসাধন ও ভাষায় ন্যাকামি সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য পঞ্চাশ বছর আগে করেছেন, আজো তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় নি। যে ন্যাকামির কথা তিনি বলেছেন, তার উৎস কি রবীন্দ্র-সাহিত্য? রবীন্দ্র-প্রভাব কি এই অতিতারল্যের মূলে আছে? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন নি; যদি দিতেন, তাহলে হয়ত আরো কিছু নোতুন অপ্রিয় সত্য আমরা জানতে পেতাম।

'শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধের গোড়ায় আমাদের দেশের অকাল-বার্ধক্য সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার প্রতিধ্বনি শুনি 'সবুজপত্র', 'সবুজপত্রের মুখপত্র' ও 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে। বস্তুত প্রমথ চৌধুরীর সমগ্র সাহিত্যসাধনার অন্যতম প্রধান বক্তব্য ছিল, আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠা। এরই অভাবে আমাদের জীবন এত নিরানন্দ, আমরা এত শীঘ্র বার্ধক্যে পৌছই ও যৌবনকে অস্বীকার করি। এজন্য তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না, সে দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে ব্যঙ্গের মাধ্যমে। এ প্রবন্ধে তারই অণুরণন শুনি—মানসিক জাড্য ও আলস্য, অকালবার্ধক্য ও তারুণ্যবিরোধিতার হাত থেকে আমাদের দেশকে—যৌবনকে বাঁচানো দরকার। এই অবনতির জন্য তিনি আমাদের রক্ষণশীল সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা—উভয়কেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, শিশুসাহিত্য বলে কোনো স্বতন্ত্র সাহিত্য নেই। যা শিশুর উপভোগ্য, তা সর্বোপভোগ্য এবং তা সাহিত্যের নিত্যবস্তু এবং সে সৃষ্টির অধিকারী কেবল প্রতিভাবান লেখক। 'আমরা রূপকথা

লিখতে বসলে, হয় তা কিছুই হবে না, নয় রূপক হবে।' শেষকালে পাই তাঁর অম্লমধুর মন্তব্য আমাদের মানসিক বার্ধক্য সম্পর্কে—'আমার মতে, বিশেষ করে শিশুসাহিত্য রচনা হতে আমাদের নিরস্ত থাকাই শ্রেয়। আমরা যদি ঠিক আমাদের উপযোগী বই লিখি, খুব সম্ভবত তা শিশুসাহিত্যই হবে।' হাজার বিরোধিতায় যে কাজ হয় না, এই মন্তব্যে সে কাজ হয়েছে, তা অবশ্যস্বীকার্য।

॥ ৫ ॥

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শ আলোচনায় 'বাংলা কাদম্বরী' (পরিচয়, মাঘ ১৩৪৪) ও 'বই পড়া' প্রবন্ধ দুটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। বাণভট্ট-চিত্রিত নারীরূপের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি রূপতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর রূপচেতনা ও সৌন্দর্যদর্শন যে ক্লাসিকাল গ্রীক সৌন্দর্যচেতনার অনুসারী, তার প্রমাণ এখানে রয়েছে। 'বই পড়া' প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, বাঙালি একদিন গ্রীক নগরসভ্যতার পথে সৌন্দর্য ও কাব্যকলার চর্চা করবে এবং বাংলাদেশ প্রাচীন আথেন্সের স্থানাধিকার করবে। এ থেকে তাঁর মানসিকতার পরিচয় পাই। কাদম্বরী আলোচনায় তাঁর রূপচিন্তার পরিচয় পাই। বাণভট্টের চিত্রনৈপুণ্য ও গদ্যরচনানৈপুণ্য স্বীকার করেও তিনি তাঁকে 'রূপশিল্পী' রূপেই দেখতে চেয়েছেন। আর্টিষ্ট হিসাবে বাণভট্টের চরম কৃতিত্ব হচ্ছে রমণীর রূপ বর্ণনায়। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ও দেখিয়েছেন—সে হচ্ছে Dream of Fair Women। ইংরেজ কবি Tennyson-এর কবিতায় fair woman-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না এবং তিনি কোনো সুন্দরীর স্বপ্ন দেখেন নি। তিনি ইতিহাস ও কাব্যের পাতার অন্তর থেকে প্রসিদ্ধ নারীদের উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এঁদের নাম আছে, কিন্তু রূপ নেই। Helen একটি মর্মরমূর্তি, ও Cleopatra-র চোখ কালো। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু বাণভট্টের সুন্দরীরা রূপলোকের real। তিনি তাঁদের শুধু রূপ দেখেছেন, দেহ নিয়ে টানাটানি করেন নি।" বাণভট্ট কেবল রূপের পূজারী—আর সে রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চৌধুরী মহাশয় বাণভট্টকে নমস্কার জানিয়ে বলেছেন,

এই রূপ নিত্য অথচ বস্তুভিত্তিক, "এই রূপ হচ্ছে reality-র পরাকাষ্ঠা।" অথচ এই সৌন্দর্য 'সত্য নারীর অতিরিক্ত সৌন্দর্য'। কাদম্বরী কথাকাব্যের তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী পত্রলেখা নিত্যরূপলোকের অধিবাসিনী, তাই তাকে দেখে চৌধুরী মহাশয় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন, "অষ্টাদশ বর্ষদেশে আছ পত্রলেখা।" তার ক্ষয় নেই, বার্ধক্য নেই, সে রূপলোকের প্রতিমা। এর ধ্যানে চৌধুরী মহাশয় বিভোর হতে চেয়েছেন। বস্তুগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ভিত্তিক অথচ নিত্যকালের স্পর্শযুক্ত যে রূপলাবণ্য, সাহিত্যের অমরলোকে প্রমথ চৌধুরী তাকেই পেতে চেয়েছেন। প্রমথ-মানসের বহুকর্ষিত রূপচেতনার যে প্রকাশ এখানে লক্ষ্য করি, তা ইন্দ্রিয়-সচেতন কিন্তু তা ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব নয়, তাতে কামনা-লালসা নেই, সুকর্ষিত রূপজ্ঞান আছে; তা কামলোকের ভঙ্গুর বস্তু নয়, রূপলোকের নিত্য সত্য। মার্জিত বুদ্ধি, সুকুমার হৃদয়বৃত্তি, সজাগ ইন্দ্রিয় ও সচেতন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আর্যমনের অধিকারী প্রমথ চৌধুরী যে সৌন্দর্যদর্শন গড়ে তুলেছেন, তা অবশ্যই সৌন্দর্যতত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনোযোগ দাবি করে।

॥ ৬ ॥

সাহিত্যচর্চার সামাজিক উপকারিতা নিয়ে প্রমথ চৌধুরী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 'বই পড়া' প্রবন্ধটিতে। তিনি বিদগ্ধ অর্থে বোঝেন কাল্‌চার্ড (cultured)। তাঁর কাছে 'কাল্‌চার' নাগরিক সভ্যতার প্রতিশব্দ।

আধুনিক যুগ গণতন্ত্র বা ডেমোক্রাসির যুগ; আর "ডেমোক্রাসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা।" এইজন্য প্রমথ চৌধুরী প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আথেন্সের অ্যারিস্টোক্রাসির পুনর্জাগরণ কামনা করেন, কারণ সেখানেই ছিল মনের মুক্তি ও সাহিত্যের অবাধ চর্চা।

আর্ট বনাম ডেমোক্রাসি: এই প্রশ্নের উত্তরে চৌধুরী মহাশয় যে কথা বলেছেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন,- "এ যুগের ডেমোক্রাটিক আত্মা আর্টকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে, সম্ভবতঃ মনে মনে হিংসাও করে; বোধ হয় এই কারণে যে, আর্টের গায়ে

আভিজাত্যের ছাপ চিরস্থায়ীরূপে বিরাজ করে। অথচ ডেমোক্রাসির এ-সত্য সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, লৌকিক মন বস্তুগত বলেই তা মেটিরিয়ালিজমের দিকে সহজেই ঝোঁকে। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আর্টের চর্চা আবশ্যক।"

ডেমোক্রাসির নাগপাশ থেকে মানুষের মনকে উদ্ধার করতে পারে সাহিত্য আর এখানেই সাহিতচর্চার সামাজিক সার্থকতা। "মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান ধর্মনীতি অনুরাগ-বিরাগ আশা-নৈরাশ্য তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য, এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সে সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে; সেই গঙ্গাতে আবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।" এই শেষ নয়, তিনি আরো বলেছেন, "মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্তি লাভ করে না। তারপর যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব সতেজ ও সবাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনশক্তির হ্রাস করা, অতএব কোনো নীতির অনুসারেই তা কর্তব্য হতে পারে না, অর্থনীতিরও নয় ধর্মনীতিরও নয়।"

চৌধুরী মহাশয় গণতন্ত্রে বা গণসাহিত্যে আস্থা রাখেন না, রাষ্ট্রিক ও মানসিক অভিজাত্যেই তাঁর মুক্তি, কালিদাসের প্রাচীন ভারতের বিলাসবহুল নীতিশাসনমুক্ত নাগরিক জীবনের প্রতি তাঁর তীব্র আসক্তি; এ সত্ত্বেও তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এই কারণে যে, তিনি সাহিত্যচর্চাকে জীবনের সকল কর্মের উপরে ঠাঁই দিয়েছেন এবং সাহিত্য মনের মুক্তি, একথা খুব জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন।

জনৈক ইংরেজ লেখক ফরাসি দেশ ও সাহিত্যের গুণগান করতে গিয়ে বলেছেন: "তুতম্ আ দ্যু পাত্রি—লা সিয়েন এ পুই লা ফ্রাঁস"—মানুষ মাত্রেরই দুইটি মাতৃভূমি: একটি তার নিজস্ব, অপরটি ফ্রান্স। ফ্রান্স তার সাহিত্য ও শিল্পে, সমাজে ও প্রকৃতিতে, বিলাসে ও জীবনসম্ভোগে নিখিলমানবের মনে মুক্তির বার্তা বহন করে আনে, এটাই উক্ত মন্তব্যের সারাৎসার। বাংলাদেশে যদি কোনো লেখকের এই মন্তব্য করার পূর্ণ অধিকার থাকে, তবে তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী।

ভাষার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী চেয়েছিলেন আমরা ফরাসি গদ্যের অনুশীলন করি। ফরাসি গদ্যের যে গুণগুলি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তা হচ্ছে—ঐক্যসমতা, প্রসাদগুণ, ভদ্রতা ও সংযম। এই গুণগুলি ফরাসি ভাষা তথা সাহিত্যের অন্তরে নিহিত আছে। আমাদের ভাষার অন্তরে ফরাসি ভাষার গতি ও স্ফূর্তি বর্তমান, এই বিশ্বাস তিনি ফরাসি গদ্যরীতির চর্চা করতে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। কেবল ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে—জীবনদর্শনে ও মানসিকতায় আমরা যদি ফরাসি সাহিত্যের অনুশীলন করি, তবে আমাদের মনের মুক্তি ঘটবে, তাঁর এই গভীর বিশ্বাসের ফল 'ফরাসি সাহিত্যের বর্ণ-পরিচয়' প্রবন্ধটি। বস্তুত প্রমথ-মানস ও তাঁর সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে এই প্রবন্ধ বিশেষ সহায়তা করে। ফরাসি সাহিত্যের মোহিনী শক্তির আকর্ষণে তিনি ধরা দিয়েছেন, ফলে ফরাসি সভ্যতার অনুরাগী হয়েছেন, একথা তিনি এ প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন।

ফরাসি সাহিত্য যে বস্তুগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়জগতের প্রতি সমস্ত অনুরাগ ও মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে, তা যে আলোকপ্রিয় অর্থাৎ স্পষ্ট স্ফুট মনোভাবের কারবারী, তা যে স্বচ্ছ উজ্জ্বল, তা যে স্পষ্টভাষী অর্থাৎ ভাষায় জড়তা বা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই, তা যে হাসতে জানে এবং তীক্ষ্ণ হাসির বাণে সমাজ ও সাহিত্যের সকল অনাচারের মর্মভেদ করতে পারে, তা যে স্বচ্ছ চিন্তার বাহক, বিদ্যার ধূম নয়, উজ্জ্বল আলোর উপাসক, সেজন্যই প্রমথ চৌধুরী ফরাসি সাহিত্যের অনুরাগী। এই

গুণগুলি তিনি নিজের জীবনে চর্চা করেছেন এবং বাঙালি তার চর্চা করুক, তা একান্তভাবে কামনা করেছেন; এমন কি একথা বলেছেন, "ফরাসি সভ্যতার নির্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই মানবের মনোজগতের আলো নিভে যাবে।" নিখিল মানবমন স্বচ্ছতা উজ্জ্বলতা প্রসাদগুণ ও অনির্বাণ আলোকের জন্য ফরাসি সাহিত্যের চর্চা করবে, এই আশা সমগ্র প্রবন্ধটিতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আরো একটি কারণে তিনি ফরাসি সাহিত্যের, বিশেষ করে গদ্যসাহিত্যের ভক্ত। "ফরাসি সাহিত্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত করে, চিত্তবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল করে। সে সাহিত্য মানুষকে দেবতা হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করে। অতএব সে সাহিত্য আমাদের মনে মানুষের প্রতি, ভক্তির না হোক, প্রীতির উদ্রেক করে। কেননা তার চর্চায় স্বজাতিকে চিনতে ও বুঝতে শিখি, এবং সেই সঙ্গে আমরা ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা, গোঁড়ামি আর হাম্‌বড়ামি, মানসিক আলস্য ও জড়তা, হয় পরিহার করতে নয় গোপন করতে শিখি। ফরাসি সাহিত্য মানুষকে দেবতা নয়, সুসভ্য করে তোলে। ফরাসি সাহিত্য সকলপ্রকার কপটতার প্রবল শত্রু এবং ফরাসি-মনের এই নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসা সে সাহিত্যের সর্বপ্রধান গুণ।" এখানে ফরাসি সাহিত্যের যে চরিত্র বিশ্লেষণ প্রমথ চৌধুরী করেছেন, তার আলোকে প্রমথ-মানসকে চিনে নিতে আমাদের এতটুকু কষ্ট হয় না।

প্রমথ চৌধুরীর প্রিয় বাঙালি লেখক, কবি ভারতচন্দ্র রায়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন, প্রসাদগুণ ও আদিরস। এই প্রসাদগুণ আসলে মনেরই গুণ, ও বস্তু হচ্ছে মনের আলোক। ভারতচন্দ্রের 'সরল ও তরল ভাষা' এসেছে তাঁর প্রসন্ন মন থেকে। ভারতচন্দ্রের আদিরস বা অশ্লীলতা nature-এর নয়, তা art-সম্ভূত এবং তা গম্ভীর নয়, সহাস্য। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস, চৌধুরী মহাশয়ের মতে, আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক; জীবন নয়, মন। 'সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।" ভারতচন্দ্র এই হাসির অধিকারী। ভারত-চন্দ্র-মানস বিশ্লেষণ করে প্রমথ চৌধুরী যে ক'টি গুণের দেখা পেয়েছেন, তা সবই ফরাসি সাহিত্যে বিশেষভাবে চর্চা করা হয়েছে। তাই

ভারতচন্দ্র-শিষ্য প্রমথ চৌধুরী বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ভক্ত পাঠক। ভারতচন্দ্রের ভাষার প্রসাদগুণ ও তাঁর মানসধর্ম তাঁকে ফরাসি লেখকদের সঙ্গে একাসনে বসার অধিকার দিয়েছে, একথা প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করেন এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, "আমার বিশ্বাস, ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত, এবং তাঁর রচনা ফরাসি সাহিত্যের একটি মাষ্টারপিস্ বলে গণ্য হত।" ('ফরাসি সাহিত্যের বর্ণ পরিচয়')। মোলিয়ের, উগো, ফ্লোবেঅর, দোদে, মোপাসাঁ, গোতিয়ে, বের্গ্‌সঁ ও আনাতোল ফ্রাঁস-এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতচন্দ্র প্রমথ-মানসের একাংশে ঠাঁই নিয়েছেন জীবনদর্শনের চিন্তাসমতার জোরে। আর এখানেই, প্রমথ-মানসের স্পষ্ট রূপটি আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শের আলোচনা আমাদের এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে, তিনি প্রাণের—তারুণ্যের ও যৌবনের উপাসক, সুরুচির ভক্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের উপাসক, সামাজিক মিথ্যার শত্রু, পেগান সৌন্দর্যের ভক্ত, সাহিত্যের স্বনির্ভর স্বতন্ত্র মর্যাদার সমর্থক এবং সর্বপ্রকার নীতিশাসনের বিরোধী।

প্রমথ চৌধুরীর রূপচেতনা

বাংলা-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর ইতিহাস-স্বীকৃত আবির্ভাব নানা কারণেই স্মরণযোগ্য। তিনি যে কেবল মোহমুক্তির সাধনা ও মুক্তবুদ্ধির উপাসনা করেছিলেন, তা নয়; তিনি মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন এবং দেশব্যাপী জাড্য ও তামসিকতার নির্বাসন দাবি করেছিলেন। বস্তুত, প্রমথ চৌধুরীর মানসিকতা এদেশী ঐতিহ্যানুসারী মানসিকতা নয়। তা ইওরোপের—বিশেষ করে ফরাসি মানসিকতা। সেজন্যই তিনি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষের ভক্ত ছিলেন এবং অপ্রত্যক্ষ ও অস্পষ্টের বিরোধী ছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে এইসব গুণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আরেক দিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর মানসিকতার স্বরূপ সন্ধান করা সম্ভবপর। তা হল, তাঁর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের সাধনা। প্রমথ চৌধুরীর শিল্পিজীবনের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

জীবনের প্রথম পর্বের দুটি ঘটনা প্রমথ চৌধুরীকে রূপ-সচেতন করে তুলেছিল। ‘আত্মকথা’য় তিনি স্বীকার করেছেন অগ্রজ আশুতোষ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এর মূলে আছে। তিনি বলেছেন: “দাদার সঙ্গে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর আমার জীবন ও মনের মোড় ফিরে গেল। দাদা যে সব নূতন লেখকের বই (বিলেত থেকে) নিয়ে এসেছিলেন, আমি পূর্বে কখনো তাদের নাম শুনিনি,—যথা, রসেটি ও সুইনবর্ন প্রভৃতির কবিতা। আর ছবি সম্বন্ধে Pre-Raphaelite art-এর সঙ্গে পরিচিত হই। দাদার বাড়ীর আবহাওয়া æsthetic ছিল।” দাদার বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এই রূপচেতনার দ্বিতীয় কারণ। “পূর্বেই বলেছি যে, রূপজ্ঞানে আমি বর্জিত ছিলুম না। যে রূপ চোখে দেখা যায় সে রূপের আমি চিরকালই অনুরাগী ছিলুম। এবং এই ঠাকুর-পরিবারের তুল্য সুন্দর স্ত্রী-পুরুষ আমি অন্য কোন পরিবারে দেখিনি। যে রূপ শ্রোত্র-রসায়ন, সে রূপেরও এরা সম্যক্ চর্চা করতেন।” আর তৃতীয় কারণ—তাঁর ফরাসি

সাহিত্য-প্রীতি। এই প্রীতির পরিচয় তাঁর রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

এই ইন্দ্রিয়নির্ভর রূপ-সচেতনতার প্রমাণ পাই প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায়। ভারতবর্ষ যে প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের চর্চা করত, তার নানা প্রমাণ উদ্ধার করে তিনি এ-কথাই বলতে চেয়েছেন, একে অস্বীকার করার অর্থ জীবনকে অস্বীকার করা। অধুনা আমরা রূপের চর্চা ত্যাগ করে, হয় অ-বাস্তব ধোঁয়াটে অ-রূপের ব্যর্থ সন্ধান করি, অথবা, কামের পঙ্কে ডুব দিই। এ দুই-ই পরিত্যাজ্য। তাঁর কাছে রূপের সাধনাই আলোর সাধনা; একেই তিনি বলেছেন যৌবনের সাধনা, অন্য কথায় তা জীবনের সাধনা।

॥ ২ ॥

এ-প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী নিজস্ব বক্তব্য পুরোপুরি পাই 'রূপের কথা' প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "বাঙালি বৃথা গর্ব করে তারা অধ্যাত্মজ্ঞানী বৈরাগী, আসলে তারা রূপান্ধ।" রূপান্ধতার অপর নাম জীবন-অস্বীকৃতি। এখানেই তাঁর প্রবল আপত্তি। আমাদের দেশে রূপ জিনিসটাকে অনেকে পাপ মনে করেন। চৌধুরী মহাশয় বলেছেন, তাঁরা রূপের বিকৃত অর্থ করে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎকে অস্বীকার করে।

রূপান্ধদের প্রতিবাদ করে তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন: "বস্তুর রূপ বলে যে একটি ধর্ম আছে—এ হচ্ছে, শোনা কথা নয়, দেখা জিনিস। যার চোখ-নামক ইন্দ্রিয় আছে তিনি কখনো-না-কখনো তার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। এবং আমাদের সকলেরই চোখ আছে; সম্ভবতঃ শুধু তাঁদের ছাড়া, যারা সৌন্দর্যের নাম করলেই অতীন্দ্রিয়তার ব্যাখ্যান অর্থাৎ উপাখ্যান শুরু করেন। কিন্তু আমি এই রূপ জিনিসটাকে অতিবর্জিত ইন্দ্রিয়ের কোঠাতেই টিঁকিয়ে রাখতে চাই; কেননা অতীন্দ্রিয় জগতের রূপ নিশ্চয়ই অরূপ হয়ে যায়।".

প্রাচীন গ্রীস, ইতালি, ভারত, বর্তমান ইওরোপ, চীন, জাপান—সর্বত্রই এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের আদর ছিল ও আছে। আজকে একে আমরা অস্বীকার করে জীবন-বিমুখিতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়

দিচ্ছি। সভ্যতার সঙ্গে সুন্দরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, আছে ও থাকবে: দৃঢ়কণ্ঠে এ কথা চৌধুরী মহাশয় ঘোষণা করেছেন 'রূপের কথা' প্রবন্ধে।

এরপর সংস্কৃত সাহিত্য ও চৈতন্য-প্রভাবিত বৈষ্ণবসাহিত্যের কথা উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, দু ক্ষেত্রেই রূপের আদর ছিল। "আমরা যাকে সংস্কৃত কাব্য বলি; তাতে রূপবর্ণনা ছাড়া আর বড় কিছু নেই; আর সে রূপবর্ণনাও আসলে দেহের, বিশেষতঃ রমণীদেহের বর্ণনা; কেননা সে কাব্যসাহিত্যে যে প্রকৃতি-বর্ণনা আছে তাও বস্তুতঃ রমণীর রূপবর্ণনা। প্রকৃতিকে তাঁহারা সুন্দরী রমণী হিসেবেই দেখেছিলেন।" পুনশ্চ, "আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু সে সৌন্দর্যকে একটি অমূল্য বস্তু বলে মনে করতেন; শুধু স্ত্রীলোকের নয়, পুরুষের রূপের উপরও তাঁদের ভক্তি ছিল। যাঁর অলোকসামান্য রূপ নেই, তাঁকে এ দেশে পুরাকালে মহাপুরুষ বলে কেউ মেনে নেয় নি। শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সকলেই সৌন্দর্যের অবতার ছিলেন।" পুনরপি, "আমাদের এই কোণঠাসা দেশে যেদিন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় সেইদিনই বাঙালি সৌন্দর্যের আবিষ্কার করে। এর পরিচয় বৈষ্ণবসাহিত্যে পাওয়া যায়।"

এই তিনটি মন্তব্যের মধ্য দিয়ে যে প্রমথ চৌধুরীকে পাই, তিনি রূপের পূজারী—রূপচর্চাতেই জীবনের আনন্দকে পেয়েছেন। কেন তিনি ইন্দ্রিয়জ রূপকে এত প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, "ইন্দ্রিয়জ বলে বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন; কেননা ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধনসূত্র। এবং ঐ সূত্রেই রূপের জন্ম।" এখানে আমরা প্রি-রাফেলিট কবিগোষ্ঠী ও ফরাসি সাহিত্যের ভক্ত প্রমথ চৌধুরীকে আবিষ্কার করতে পারি।

কেন আমরা রূপের চর্চা করব? কেননা, "রূপজ্ঞানের প্রসঙ্গে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্যসমাজের গোড়ার কথা হলেও, সুরুচি তার শেষ কথা। শিব সমাজের ভিত্তি আর সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।"

সুন্দরের চর্চা তাই প্রমথ চৌধুরীর মতে সভ্যসমাজের চরম কীর্তি। এ থেকে যে বঞ্চিত, সে দুর্ভাগা। এই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে তিনি

বাঙালিকে বাঁচাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা সব জন্মতঃ কামলোকের অধিবাসী; সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।...আর যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি নে, তা হলে আমাদের সুন্দরভাবে মরাই শ্রেয়।" ['রূপের কথা']

রূপতান্ত্রিক প্রমথ চৌধুরীর সৌন্দর্যদর্শন তথা জীবনদর্শনের এই সার প্রমথ-মানসের এক নোতুন পরিচয় পাঠকের সামনে উদ্ঘাটিত করে দেয়। প্রবন্ধাবলীতে যেখানেই তিনি জীবনের বা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেখানেই তিনি এই রূপজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। সমাজজীবনে রূপের চর্চা থেকে তিনি সাহিত্যে রূপচর্চাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি, রূপের অদ্বয় মূর্তির উপাসনাই করেছেন।

এই প্রখর সৌন্দর্যচেতনা, রূপজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপের প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাই 'জয়দেব', 'ভারতচন্দ্র', 'চিত্রাঙ্গদা', 'বাংলার কাদম্বরী', 'সবুজপত্র', বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' প্রভৃতি প্রবন্ধে। সতর্ক পাঠক এগুলি থেকেই চৌধুরী মহাশয়ের এই রূপচেতনার পরিচয় পেতে পারবেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক প্রমথ চৌধুরী কী ভাবে সে সাহিত্যের রূপসায়রে ডুব দিয়ে মণিমাণিক্য আহরণ করেছেন, তার সুন্দর পরিচয় পাই 'বাংলার কাদম্বরী' শীর্ষক সমালোচনা-প্রবন্ধে (পরিচয়', মাঘ ১৩৪৪)। বাণভট্টের যে কৃতিত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, সে আলোচনাতেই তাঁর রূপচিন্তার তত্ত্বটি পাই। কাদম্বরী কথাকাব্যে বাণভট্ট একটি উজ্জ্বল মাল্য রচনা করেছেন, তাতে লাবণ্যের ঢেউ খেলে যায়: এ কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি। 'কাদম্বরী'তে landscape ও portrait painting-এর উৎকর্ষ চৌধুরী মহাশয় লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এহ বাহ্য। তিনি বাণভট্টকে 'রূপশিল্পী' বলেছেন। "আর্টিষ্ট হিসাবে বাণভট্টের চরম কৃতিত্ব হচ্ছে রমণীর রূপবর্ণনায়। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ও আমাদের দেখিয়েছেন—সে হচ্ছে Dream of Fair Women। ইংরেজ কবি Tennyson-এর কবিতায় fair women-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না এবং তিনি কোনো সুন্দরীর স্বপ্ন দেখেন নি। তিনি ইতিহাস ও কাব্যের পাতার অন্তর থেকে প্রসিদ্ধ নারীদের উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এদের নাম আছে, কিন্তু রূপ

নেই। Helen একটি মর্মরমূর্তি ও Cleopatra-র চোখ কালো। এর বেশি কিছু নয়। বাণভট্টের সুন্দরীরা রূপলোকের real। তিনি তাঁদের শুধু রূপ দেখেছেন, দেহ নিয়ে টানাটানি করেন নি।" বাণভট্ট কেবল রূপের পূজারী। প্রমথ চৌধুরী তাই আর্টিষ্ট বাণভট্টকে নমস্কার করেছেন, "কেননা এ রূপ নিত্য অথচ বস্তুভিত্তিক, এই রূপ হচ্ছে reality-র পরাকাষ্ঠা।" অথচ এ সৌন্দর্য "সত্যনারীর অতিরিক্ত সৌন্দর্য"। কাদম্বরী কথাকাব্যের তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী পত্রলেখা নিত্য-রূপলোকের অধিবাসিনী। তাই তাকে দেখে চৌধুরী মহাশয় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন,—"অষ্টাদশ বর্ষদেশে আছো পত্রলেখা।" তার ক্ষয় নেই, বার্ধক্য নেই, সে রূপলোকের প্রতিমা, আর সে প্রতিমার নির্মাতা রূপশিল্পী বাণভট্ট। এখানেই প্রমথ চৌধুরীর রূপানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে।

এই রূপানুভূতি আরো স্পষ্ট হয়েছে 'জয়দেব' ও 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধ দুটিতে। দুটি প্রবন্ধেই প্রমথ চৌধুরী স্বীকার করেছেন, এঁরা দুজন সব সময় শ্লীলতার গণ্ডী রক্ষা করেননি। কিন্তু তিনি জয়দেবের তীব্র নিন্দা ও ভারতচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। জয়দেব যে কামলোকের কবি, রূপলোকের নন, তা উক্ত প্রবন্ধে চৌধুরী মহাশয় দেখিয়েছেন। গীতগোবিন্দ যে কেবল "বিলাস-কলাকুতূহল" কথা, সে কাব্যে যে কেবল দেহসর্ব্বস্ব নির্লজ্জা রাধিকাপ্রমুখ গোপযুবতীদের বর্ণনা আছে এবং সেখানে যে রমণীর রূপবর্ণনার অভাব এবং কামবর্ণনার প্রাবল্য, তাই চৌধুরী মহাশয়কে জয়দেবের প্রতি বিমুখ করেছে। আর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে দেখি আর্টিষ্ট ভারতচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা। "ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে, অপরের আছে শুধু nature"। জয়দেব সেই অপর কবি, তাই তিনি নিন্দিত। জীবনের সকল দুঃখ-যন্ত্রণা, দৈবদুর্বিপাক, দারিদ্র্য ভারতচন্দ্রকে নিরানন্দ করতে পারে নি, করেছিল শুধু "প্রমোদের প্রভু"। "এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যাবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিষ্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিন্‌কালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়।" এই দুই প্রবন্ধে দেখি, চৌধুরী মহাশয় আর্টকে সবকিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। সেইজন্য তিনি জয়দেবের নিন্দা ও ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করেন। হীরা মালিনী ও সুন্দর কামলোকের

নয়, রূপলোকের অধিবাসী, তাই তারা অমর,·একথাই প্রমথ চৌধুরী আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন।

যেখানেই কামলোকের উপরে রূপলোকের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেখানেই প্রমথ চৌধুরী কবির সমর্থনে এগিয়েছেন। যে রূপ সাংসারিক প্রয়োজনে লাগে না, কামচারিতায় আবদ্ধ হয় না, সংসারের শাসনকে অগ্রাহ্য করে, তিনি তারই সমর্থন করেছেন। তাই শ্লীলতা অশ্লীলতা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, আর্টের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিই তাঁর কাছে বড় কথা। এই জিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য অবলম্বনে লিখিত 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধ।

'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধেও প্রমথ চৌধুরী 'রূপের কথা' প্রবন্ধে উল্লিখিত রূপলোক ও কামলোকের কথা তুলেছেন এবং 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের স্থান কোন্ লোকে, তা বিচার করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, কামলোকের উপরে রূপলোক বলে আর একটি লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপ-লোকে তুলতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপলোকের বস্তু, কামলোকের নয়, তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যাঁদের তা নেই, অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।" এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী এটাই প্রমাণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ রূপলোক সৃষ্টি করেছেন এবং চিত্রাঙ্গদা সেই রূপ-লোকের প্রতিমা, সে রূপলোকের real। জয়দেব তা পারেন নি বলেই ব্যর্থ হয়েছেন।

এই রূপলোক রবীন্দ্রনাথ কী কৌশলে সৃষ্টি করেছেন, তা প্রমথ চৌধুরী নিপুণভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন। "চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্ন মাত্র, মানবমনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মণিপুরের রাজকন্যা নন, সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী। আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানবমনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় সুরে ও ছন্দে, নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল ও শক্তি।" রবীন্দ্রনাথ সেই শক্তির অধিকারী বলেই তিনি কালিদাসের সমগোত্রীয় কবি ও পূর্ণ আর্টিষ্ট। "মানুষমাত্রই বাস করে কতকটা কর্মজগতে আর কতকটা

স্বপ্নলোকে। এই স্বপ্নকে যাঁরা সম্পূর্ণ সাকার করে তুলতে পারেন অর্থাৎ সমগ্র ও পরিচ্ছিন্ন রূপ দিতে পারেন, তাঁরাই হচ্ছেন পূর্ণ আর্টিস্ট। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য মানুষের যৌবনস্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র।"

এই অপূর্ব যৌবনস্বপ্নের কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা'র পরিচয় দিতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী পুনর্বার প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন: "কোন কাব্যের আত্মার পরিচয় দেওয়ার চাইতে তার দেহের পরিচয় দেওয়াটা ঢের সহজ, কেননা দেহ জিনিসটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিচ্ছিন্ন।" ভাবের দেহ ভাষা, তাই তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের ভাষার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের আলোচনার মাধ্যমে "যৌবনস্বপ্নের রাগিণী চিত্রাঙ্গদা"র পরিচয় উপস্থিত করেছেন। চিত্রাঙ্গদার কাব্যশরীরের লোকোত্তর রূপলাবণ্য কতটা ফুটে উঠেছে, তার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি কয়েকটি চরণ উদ্ধার করেছেন, এখানেই রূপবিলাসী সমালোচকের দেখা পাই:

যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল, শুধু একবেলা
পরমায়ু—তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনান্তের
আনন্দমর্মর, পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুয়াইয়া গ্রীবা
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদি-অন্ত-হারা।

[চিত্রাঙ্গদার উক্তি]

এই রূপচেতনার স্পষ্ট পরিচয় পাই 'সবুজপত্র' প্রবন্ধে। মনে হয়, প্রমথ চৌধুরী—সবুজ রং যে প্রাণের রং, এ তত্ত্বটি বোঝাতে গিয়ে বর্ণভাণ্ডের সমস্ত রং উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। প্রকৃতিতে কত যে রং ফুটে ওঠে প্রাণের স্পর্শে, তা চক্ষুষ্মান সজাগ লেখকের বর্ণালিম্পনে ধরা পড়েছে। সবুজ রঙের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে লেখক বলেছেন: "বেগুনি কিশলয়ের রং, জীবনের পূর্বরাগের রং;

লাল রক্তের রং, জীবনের পূর্ণরাগের রং ; নীল আকাশের রং, অনন্তের রং ; পীত শুষ্ক পত্রের রং, মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীনপত্রের রং, রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি। তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্বসীমায় বেগুনি আর পশ্চিমসীমায় লাল। অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের, অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম।···সবুজের মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। উষার গোলাপি, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীললোহিত, বিরোধালংকারস্বরূপে সবুজপত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতদ্যুতি কখনো উজ্জ্বল, কখনো কোমল করে তুলবে।"

প্রমথ চৌধুরী যে প্রি-রাফেলিট ছবি ও কবিতার অনুরাগী ছিলেন, তার পরিচয় এখানে পাই। বর্ণভাণ্ড নিঃশেষ করে নৈপুণ্যের বর্ণালিম্পন-অংকনের দুরূহ শিল্পবিদ্যা তাঁর আয়ত্তে ছিল, এ বর্ণনা তার প্রমাণ। এর পেছনে রয়েছে একটি অতন্দ্র প্রখর ইন্দ্রিয়-সচেতন রূপতান্ত্রিক শিল্পীমন।

রূপের উৎস ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, আর কবিকল্পনার ভিত্তি বস্তুজ্ঞান, এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' প্রসঙ্গে শেষ দুটি অনুচ্ছেদে তিনি এটি স্পষ্ট আলোচনা করেছেন। সৌন্দর্যের দর্শনলাভের জন্য শিবনেত্র হবার প্রয়োজন নেই, বরং চোখ খোলা রেখে বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে দুটি নয়ন মেলে দেখাই যথার্থ সৌন্দর্যদর্শন।

॥ ৩ ॥

এই ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানভিত্তিক রূপজ্ঞানের পরিচয় স্পষ্টতর হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলিতে। 'চার-ইয়ারী কথা' ও অন্যান্য ছোট গল্পে নারীরূপের যে বর্ণনা পাই, তাতে এ ধারণাই সমর্থিত হয়। নারীরূপ-বর্ণনাতেও প্রমথীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান। বাংলা উপন্যাসের বাঁধাধরা বর্ণনা বর্জন করে তিনি নাম নয়, রূপের উপরেই জোর দিয়েছেন। রূপলোকের real-কে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলি দেশকালের গণ্ডীতে ধরা দেয় না। তাদের বর্ণনায় যে প্রত্যক্ষতা,

ঋজুতা, ভাস্কর্য-সুলভ স্পষ্টতা, গ্রীসীয়সুলভ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ও detail• রঙের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তা চিরাচরিত নয়। অথচ এই বর্ণনা কোথাও সম্ভোগে আবিল নয়, তা রূপধ্যানে ভাস্বর। অতিস্পষ্ট প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বর্ণনা যে স্থূল বস্তুসর্বস্বতা ও পঙ্কিল যৌনলালসায় পরিণত হয় নি, তার মূলে আছে প্রমথ চৌধুরীর অসাধারণ শিল্পসংযম। এই সব ক'টি গুণেরই পরিচয় তাঁর গল্পে ছড়িয়ে আছে। তাঁর রমণীমূর্তিরা গ্রীক সৌন্দর্যজগতের অধিবাসিনী। রং-রেখার অ-সাধারণ প্রয়োগের নমুনা তাঁর গল্প থেকে এখানে যদৃচ্ছ তুলে দিচ্ছি।

(ক) "চমৎকার দেখতে, একেবারে নীলপাথরের ভেনাস। তার গলায় ছিল লাল রঙের পুঁতির মালা, দু কাণে দুটি বড় বড় প্রবাল গোঁজা আর ডান হাতের কব্জায় একটি পুরু শাঁখার বালা। মাথার বাঁদিকে চূড়ো বাঁধা ছিল, আর পরণে এক চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ী।" [ভূতের গল্প]

(খ) "সেই গ্রীসিয়ান নাক, সেই ভায়ালেট চোখ। আর সেই ঠোঁটচাপা হাসি, যার ভিতর আছে শুধু যাদু।" [মেরি ক্রিসমাস]

(গ) "যা দেখলুম তাতে মনে হল সুন্দরী স্ত্রীলোক নয়—শ্বেতপাথরে খোদা দেবীমূর্তি, তার সকল অঙ্গ-দেবতার মতই সুঠাম, দেবতার মতই নিশ্চল, আর তার মুখ দেবতার মতই প্রশান্ত আর নির্বিকার।" [একটি সাদা গল্প]

(ঘ) "সেখানে গিয়ে দেখি, যিনি একটি রাঙ্কব আসনে উপবিষ্ট আছেন, তিনি স্বয়ং সরস্বতী, তন্বী, গৌরী, বিগাঢ়-যৌবনা, শ্বেত-বসনা।" [বীণাবাই]

(ঙ) "তাঁর মূর্তি সিংহবাহিনী প্রতিমার মত ছিল এবং সেই প্রতিমার মতই উপরের দিকে কাণ তোলা তাঁর চোখ দুটি, দেবতার চোখের মত স্থির ও নিশ্চল ছিল। লোকে বলত সে চোখে কখনও পলক পড়ে নি। সে চোখের ভিতর যা জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছিল, সে হচ্ছে চারিপাশের নরনারীর উপর তাঁর অগাধ অবজ্ঞা।" [আহুতি]

(চ) "সে আপাদমস্তক বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তার চোখের কোণ থেকে, আর আঙ্গুলের ডগা দিয়ে অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ ঠিকরে বেরুচ্ছিল। Leyden jar-এর সঙ্গে স্ত্রীলোকের তুলনা দেওয়াটা যদি সাহিত্যে

চলত, তা হলে ঐ কথাতেই আমি সব বুঝিয়ে দিতুম। সাদা কথায় বলতে গেলে প্রাণের চেহারা তার চোখ-মুখ, তার অঙ্গভঙ্গী, তার বেশভূষা সকলের ভিতর দিয়ে অবাধে ফুঁটে বেরুচ্ছিল।" [ছোট গল্প]

(ছ) "তার মুখের আধখানা ছায়ায় ঢাকা পড়াতে বাকি অংশটুকু স্বর্ণমুদ্রার উপর অঙ্কিত গ্রীকরমণীর মূর্তির মত দেখাচ্ছিল—সে মূর্তি যেমন সুন্দর, তেমনি কঠিন।" [চার-ইয়ারী কথা]

(জ) "এই রমণীটির শরীরের গড়ন ও চলবার ভঙ্গীতে শিকারি-চিতার মত একটা লিক্‌লিকে ভাব আছে।" [তদেব]

(ঝ) "দেখি, সেই মুখটেপা হাসি তার মুখে লেগেই রয়েছে। ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে, এ হাসি তার মুখের নয়—চোখের। ইস্পাতের মত নীল, ইস্পাতের মত কঠিন দুটি চোখের কোণ থেকে সে হাসি ছুরির ধারের মত চিক্‌চিক্ করছে।" [তদেব]

(ঞ) "আমার চেহারা ঠিক Botticelli-এর ছবির মত হয়েছিল। হাত-পাগুলি সরু সরু, আর লম্বা লম্বা। মুখ পাতলা, চোখ দুটি বড় বড়, আর তারা দুটো যেমন তরল, তেমনি উজ্জ্বল। আমার রং হাতীর দাঁতের রংয়ের মত হয়েছিল, আর যখন জ্বর আসত, তখন গাল দুটি একটু লাল হয়ে উঠত।" [তদেব]

(ট) "দেখি কিছুক্ষণ আগে যে চোখ হীরার মত জ্বলছিল, এখন তা নীলার মত সুকোমল হয়ে গেছে ;—একটি গভীর বিষাদের রঙে তা স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে উঠেছে ;—এমন কাতর, এমন করুণ দৃষ্টি আমি মানুষের চোখে আর কখনও দেখি নি।" [তদেব]

আশা করি, উপরিধৃত উদ্ধৃতিগুলি এ কথার প্রমাণ দেবে যে, প্রমথ চৌধুরী-সৃষ্ট রমণীরা গ্রীকসৌন্দর্যলোকের অধিবাসিনী ; তারা কামলোকের নয়, রূপলোকের। এই সৃষ্টির পিছনে রয়েছে একটি অতন্দ্র ইন্দ্রিয়সচেতন প্রত্যক্ষ বস্তুজ্ঞানসমৃদ্ধ শিল্পীমন। এখানে প্রমথ চৌধুরী ক্লাসিকাল মার্গের পথিক।

কেবল নারীরূপবর্ণনায় নয়, প্রকৃতিচিত্রণেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 'চার-ইয়ারী কথা'র সূচনায় যে তামসী-বর্ণনা, তা চিরাচরিত প্রথানুবর্তন নয়। সেখানে দেখি, "এ যেন আর এক পৃথিবীর আর এক

আকাশ; দিনের কি রাত্তিরের বলা শক্ত। মাথার উপরে কিম্বা চোখের সুমুখে কোথায়ও ঘনঘটা করে নেই, আশেপাশে কোথায়ও মেঘের চাপ নেই, মনে হল কে যেন সমস্ত আকাশটিকে একখানি একরঙা মেঘের ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছে, এবং সে রং কালোও নয় ঘনও নয়; কেননা তার ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। ছাই-রঙের কাঁচের ঢাকনির ভিতর থেকে যে রকম আলো দেখা যায়, সেই রকম আলো। আকাশজোড়া এমন মলিন, এমন মরা আলো আমি জীবনে কখনও দেখিনি। পৃথিবীর উপরে সে রাত্তিরে যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল। এ আলোর স্পর্শে পৃথিবী যেন অভিভূত, স্তম্ভিত, মূৰ্ছিত হয়ে পড়েছিল। চারপাশে তাকিয়ে দেখি,—গাছপালা, বাড়ী-ঘর-দোর সব যেন কোন আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় মরার মত দাঁড়িয়ে আছে; অথচ এই আলোয় সব যেন একটু হাসছে।" অন্ধ তামসীরাত্রির uncanny feeling সৃষ্টি করতে এ বর্ণনা সাফল্যলাভ করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আবার যেখানে উজ্জ্বলবর্ণের সমারোহ, সেখানেও অনুরূপ সাফল্যের পরিচয় পাই; যেমন, এই গ্রন্থের—"মাথার উপরে সোনার আকাশ, পায়ের নীচে সবুজ মখমলের গালিচা, চোখের সুমুখে হীরেকষের সমুদ্র, আর ডাইনে বাঁয়ে শুধু ফুলের জহরৎ-খচিত গাছপালা—সে পুষ্পরত্নের কোনটি বা সাদা, কোনটি বা লাল, কোনটি বা গোলাপি, কোনটি বা বেগুনি।" রঙে রেখায় প্রমথ চৌধুরী যে স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতার ভক্ত ছিলেন, তার প্রমাণ এখানে পাই। বাণভট্টের শিল্পগুণ-আবিষ্কারে যত্নবান যে সমালোচক, তিনি এখানে সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত। শিল্পজ্ঞান ও শিল্পসৃষ্টিতে প্রমথ চৌধুরীর অভিজ্ঞতা প্রবন্ধে ও গল্পে স্বতঃই প্রমাণিত।

॥ ৪ ॥

এই রূপসচেতনতার পরিচয় প্রমথ চৌধুরীর কবিতা-সংকলন দুটিতে—'সনেট-পঞ্চাশৎ' ও 'পদ-চারণ'-এও পাই। যে স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় গল্পে ও প্রবন্ধে বর্তমান, তা এখানেও উপস্থিত। সেই প্রখর সৌন্দর্যচেতনা, প্রবল রূপতৃষ্ণা, গভীর আনুপূর্বিক বর্ণনার প্রতি ঝোঁক, সংহত প্রস্তর-কঠিন মসৃণ লাবণ্য, ভাস্কর্যসুলভ শিল্পনৈপুণ্য কবিতায় বর্তমান। সনেটকে

"প্রমথ চৌধুরী 'বিগাঢ়যৌবনা তন্বী' বলে সম্বোধন করেছেন; তাঁর শিল্প-প্রতিমাই তা-ই। এই প্রত্যক্ষ রূপচেতনার ভিত্তিতে নির্মিত যে কাব্যপ্রতিমা, তার সার্থক বর্ণনা পাই 'প্রতিমা' সনেটটিতে:

"প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ করে'।
আঁধারে আবৃত কত খুঁজে গুপ্ত খনি,
এনেছি তারার মত জ্যোতির্ময় মণি,—
রত্ন দিয়ে দেবীমূর্তি গড়িবার তরে।
স্ফটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধরে,'
পরায়েছি শ্যাম-শাটী মরকতে বুনি,
রক্তবিন্দু পারা দুটি সুলোহিত চুনি
বিন্যস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে।
প্রজ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন,
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
মুকুতা-নির্মিত যুগ্ম ঘন-পীন-স্তন,
সুকঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ।
অপূর্ব সুন্দর মূর্তি, কিন্তু অচেতন,—
না পারি পূজিতে কিম্বা দিতে বিসর্জন।"

রোমান্টিক কাব্যসংসারে প্রমথ চৌধুরী ক্লাসিকাল কাব্যপ্রতিমাস্থাপনে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং গ্রীক ভাস্কর্যের আধারে সে প্রতিমাকে খোদাই করেছিলেন, এই সনেটে তারই পরিচয় বিধৃত হয়েছে। কাব্যজীবনে সাফল্য-অসাফল্যের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও একথা এখানে অবশ্যস্বীকার্য যে, প্রখর রূপচেতনাই জয়লাভ করেছে এবং চুনি-পান্না-মুক্তা-প্রবাল-হীরক-কঠিন দীপ্তিতে সে প্রতিমা উদ্ভাসিত হয়েছে।

'বসন্তসেনা' 'পত্রলেখা' 'তাজমহল' প্রভৃতি সনেটে পুরাণ-ইতিহাস-প্রোক্ত সুন্দরীর বর্ণনায় অথবা 'ধুতুরার ফুল', 'কাঁঠালি-চাঁপা', 'করবী', 'কাঠ-মল্লিকা' প্রমুখ সনেটে এই স্বতন্ত্র বিশিষ্ট প্রখর রূপচেতনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। বর্ণালিম্পনের প্রয়োগনৈপুণ্যে এই সনেটগুলিতে রূপচিত্র প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ লাভ করেছে, তা সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। দার্জিলিঙে চেরি-পুষ্প দেখে তিনি যে সনেটটি লিখেছেন [চেরিপুষ্প, পদ-চারণ], তাতে এই বৈশিষ্ট্য অতি স্পষ্ট:

বসন্তের আগমনে আজো আছে দেরি,
পর্বতের স্তরে স্তরে বিরাজে তুষার।
চুরি করে' ফিকে রঙ গোলাপী উষার,
লাজমুখে ফুটিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে চেরি!
পত্রহীন শাখাগুলি ফেলিয়াছে ঘেরি,
বর্ষিয়া তাহার অঙ্গে কুঙ্কুম আসার।
সে জানে, যে বোঝে অর্থ ফুলের ভাষার,
বসন্তের ঘোষণার তুমি রত্নভেরী !
মর্মর-কঠিন শুভ্র-তুষারের গায়ে
পড়েছে রূপের তব রঙীন আলোক,
পূর্বরাগে লিপ্ত তব কর-পরশনে,
শিশিরে বসন্ত-স্মৃতি তুলেছে জাগায়ে।
রক্তিম আভায় যেন ভরিয়া ত্রিলোক
শোভিছে উমার মুখ শিব-দরশনে।

প্রমথ চৌধুরী যে প্রি-রাফেলিট ছবি ও কবিগোষ্ঠীর অনুরাগী ছিলেন, তার প্রমাণ পাই এখানে। স্যুইনবর্ন, মরিস ও ক্রিশ্চিনা রসেটির কবিতায় যে চিত্রলোক, রূপলোক, স্বপ্নলোকের দেখা পাই, তারই চকিত আভাস পাই উল্লিখিত সনেটগুলিতে। বর্ণালিম্পনে ও চিত্রাংকনে সেই নৈপুণ্য, গ্রীসীয় রূপলোকের প্রতি সেই আসক্তি, প্রত্যক্ষ রূপচেতনার সেই প্রাধান্য এখানে বর্তমান। তাই প্রমথ চৌধুরী কামলোকের নন, তিনি রূপলোকের কবি। বাংলা কাব্যসংসারে তিনি নিঃসঙ্গ পথিক— যিনি বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের পূজারী।

প্রমথ চৌধুরী ও উত্তরকাল

ব্রাইট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রমথ চৌধুরীর মজলিশে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে যাঁরা যোগ দিতেন, তাঁরাই সবুজপত্রগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এই অভিজাত বিদগ্ধ পরিবেশে যে আবহাওয়া বিরাজ করত, তা কোনো দেশ-কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। নির্বিশেষ সংস্কৃতি-সাধনাই এই মজলিশের একমাত্র সাধনা ছিল। সবুজপত্র (১৯১৪) এই গোষ্ঠীর চিন্তার আধার। এই গোষ্ঠী বিশ শতকের বাঙালির মানস-জীবনে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই মজলিশ সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

সবুজপত্রীদের স্মৃতিচারণায় শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: "সেই গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁদের কথা আমার বিশেষ করে মনে আছে, তাঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, হারীতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা সবাই সংস্কৃতি-জীবনে প্রতিযশা হয়েছেন।" ('চলমান জীবন', ১ম পর্ব, পৃঃ ২২০)। এর সঙ্গে আরো দুটি নাম যোগ করা প্রয়োজন: সুরেশ চক্রবর্তী ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী।

এই লেখক-তালিকা সযত্নে অনুধাবন করলে দেখা যায়, এঁদের লেখার মূল সুর এক, তা হল মননশীল যুক্তিভিত্তিক নির্মোহ আলোচনার সুর। সবুজপত্রের এটি প্রধানতম সুর।

অন্যতম সবুজপত্রী শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আমরা ও তাঁহারা' প্রবন্ধগ্রন্থে এই আসর সম্পর্কে কয়েকটি মূলবান মন্তব্য করেছেন। এই গ্রন্থের নব সংস্করণের ভূমিকায় (১৯৫৬) তিনি বলেছেন: "আমি যে দলে মানুষ হয়েছি তাকে Pramathean কিংবা সবুজপত্রের দল বললেই বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। কারণ আমাদের বই পড়ার অভ্যাস ও বড় বড় ব্যাপার নিয়ে তর্কপ্রবৃত্তির জন্যই প্রমথবাবু নিজের কাছে আমাদের টেনে নেন ও শিক্ষা দিয়ে সবুজপত্রের দল তৈরি করেন। সেখানে অভিব্যক্তিবাদ, নতুন ফিজিক্স্, নতুন অর্থনীতি আর নব্যদর্শন নিয়ে

আলোচনা অসামাজিক বিবেচিত হত না। বের্গসঁ, ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্ক, বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর মতামত, সংস্কৃত কি আধুনিক কবির ছন্দোবিচারের ফলে তখনকার দিনে আমরা একঘরে হইনি।"

কেবল বের্গসঁ, প্ল্যাঙ্ক ও রাসেল নয়, এইসঙ্গে শ, ক্রোচে, ফ্রয়েড, য়ুং, অ্যাডলার, অয়কেন প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীবৃন্দের বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বিষয়ক মননশীল আলোচনায় সবুজপত্রীরা মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন। এর ফলে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে একটি নোতুন যুগের সূচনা হল: তা মননশীল আলোচনার ধারা। সে আলোচনা জগদ্ধিতায় বা সমাজকল্যাণে নিয়োজিত নয়; তার ভিত্তি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, তার লক্ষ্য বুদ্ধির মুক্তি, তার সাধনা নির্বিশেষ সংস্কৃতি-সাধনা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের তদ্গত আলোচনা। প্রকাশভঙ্গীর সারল্য, অনায়াসস্বচ্ছন্দ কথ্য গদ্যরীতি, তীক্ষ্ণ সজাগ বুদ্ধিবৃত্তি: সবুজপত্রের সকল রচনাতেই উপস্থিত। সবুজপত্র কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চার বাহন ছিল না, ব্যাপকতর অর্থে সাহিত্যের বহুবিস্তৃত আলোচনা এই পত্রে গ্রথিত হয়েছে। আধুনিক ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, অলংকার-শাস্ত্র, সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, প্রত্নতত্ত্ব: সকল বিষয়ে স্বচ্ছন্দ মানস-পরিভ্রমণের পরিচয় সবুজপত্রের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। সবুজপত্র ফলতঃ সুকর্ষিত বিদগ্ধ মানসিকতার পরিচায়ক।

॥ ২ ॥

অন্যতম সবুজপত্রী শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের সাক্ষ্যে ব্রাইট ষ্ট্রীটের বাড়ির মজলিশের চেহারা সুন্দর ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, "এই মজলিশটি হল সাহিত্যিক মনের রসায়ন। বাংলা সাহিত্য, বাংলা ভাষা, বাংলা গদ্যের রচনারীতি স্বভাবত এখানে প্রায়ই আলোচনা হত। কিন্তু আলোচ্য বস্তুর তা ছিল অংশমাত্র। দেশবিদেশের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, দেশী বিদেশী রাষ্ট্রব্যাপার কিছুই বাদ যেত না। সব বিষয়ের অল্পবিস্তর বিশেষজ্ঞ দু-একজন করে মজলিশে ছিলেন। তবে সব আলোচনায় সকলেই যোগ দিতেন, এবং আলোচনার ধারা এমন ছিল

অবিশেষজ্ঞের মন ও বুদ্ধি যাতে উৎসুক ও উন্মুখ হয়ে ওঠে। কোন্ বিষয়ে নূতন ভাল বই কি বেরিয়েছে সে খবর এখানে আদান-প্রদান হ'ত, আর সে পুঁথি সংগ্রহ করে পড়া ছিল অনেক মজলিশির অবশ্য কর্তব্য। বেশির ভাগ বইএর খবর প্রমথবাবুই দিতেন এবং তিনিই কিনতেন। তাঁর বই মজলিশিদের হাতে হাতে ফিরত। বাঙালি লেখকদের মনের পুঁজি যে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির লেখকদের মনের পুঁজির চেয়ে কম হবে না, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি লেখকের মনের যোগ হবে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ—এটা ছিল মজলিশের অকথিত স্বীকৃতি। আর তার আয়োজন ও উপকরণের যোগান এখানে চলত। আলোচনার লক্ষ্য ছিল, এসব বস্তু যাতে মনকে পুষ্টি ও স্ফূর্তি দেয়, তার বোঝা না হয়ে ওঠে। বিনা বিচারে কোনও কিছু মানা হবে না। বুদ্ধিতে যা বাধে তাকে অগ্রাহ্য করতে হবে, তার সমর্থনে যত বড় নামই থাক না কেন। 'বাধিতমর্থং বেদোঽপি ন বোধয়তি'—তা সে বেদ সংস্কৃতেই লেখা হোক, কি ইংরেজি ফরাসি জার্মান ভাষাতেই লেখা হোক। বলা বাহুল্য. বহু বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করা, ও যাচাই না করে তাকে স্বীকার না করা, এ দুটি ছিল প্রমথবাবুর মনের প্রতিচ্ছবি। মজলিশিদের অল্পবিস্তর সমধর্মী মনে তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি একদিন দেশের প্রাচীন ভাবধারাকে যাচাই করেছিল পাশ্চাত্ত্য ভাবের নূতন আলোতে। সবুজপত্রের যুগে প্রয়োজন হয়েছিল এই নূতন ভাবকে যাচাই করার। সে প্রয়োজন এখনও আছে। প্রমথবাবু আমাদের উৎসাহিত করতেন এই নূতন ভাব ও সাহিত্যকে প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাব ও সাহিত্যের আলোতে পরীক্ষা করতে। প্রাচীন ভারতবর্ষের যে সভ্যতা সচল ও সৃষ্টিকুশল ছিল তার সঙ্গে প্রমথবাবুর মনের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তাঁর নিজের মন এই ঘনিষ্ঠতার দিকে আমাদের অনেকের মনকে অনুকূল করেছিল।" (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের এই সাক্ষ্য গোষ্ঠীপতির কৃতিত্বের পরিচায়ক। আবেগপ্রবণ যুক্তিবিরোধী ভাবালু বাঙালি মনকে আবেগমুক্ত নির্মোহ যুক্তি ও বুদ্ধির রাজপথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব প্রমথ চৌধুরী দাবি করতে পারেন। এবং এ দাবি যথার্থ। এই উদ্ধৃতি থেকে

প্রমথ চৌধুরীর দুটি কৃতিত্ব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভট্টবানের ভাষায় সে দুটি বিবরণ দেওয়া যায় এই কথায়—তিনি "প্রবর্তয়িতা গোষ্ঠী-বন্ধানম্" এবং "অখিলকলাকলাপলোচনকঠোরমতিঃ নিখিলশাস্ত্রাবগাহন-গভীরবুদ্ধিঃ।"

গোষ্ঠীপতি প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্ব আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এই বিষয়ে শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ সে পত্রে বলেছেন: "আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ কার হাল ডাইনে বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড়ো করে আমার মনে পড়ে। তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথর নাম আমার বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। অনেককাল পর্যন্ত যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পারে নি তাদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গশিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার স্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত। এত বেশি নির্বিকার তাঁর মন যে বাঙালী পাঠক অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারে নি, মুশকিল এই যে বাঙালী কাউকে কোন একটা দলে না টানলে বুঝতেই পারে না।" (দ্রঃ 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা', পৃঃ।৵০, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত।)

॥ ৩ ॥

প্রমথ চৌধুরীর এই 'বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতা'র প্রভাব সবুজপত্রীদের উপর যতটা কার্যকরী হয়েছিল, পরবর্তীদের উপর ততটা কার্যকরী হতে

পারে নি। উত্তরকালের উপর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব আলোচনায় এ সত্যটি অবশ্যস্বীকার্য।

সবুজপত্রীরা যে প্রমথ চৌধুরীর শিক্ষায় নিজেদের গড়ে তুলেছিলেন, তার পরিচয় এখানে জানা প্রয়োজন। 'অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত করার দুরূহ ক্ষমতা' ও 'কলার অমূল্য আত্মসংযম': এ দুটির উপর তিনি বারবার জোর দিয়ে এসেছেন। সবুজপত্রীরা সযত্নে এই শিক্ষাকে নিজেদের রচনায় আয়ত্ত করেছেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (পণ্ডিচেরি) রচিত 'সবুজকথা' গ্রন্থে এর সমর্থন পাই এই ক'টি কথায় —"শব্দের দেহায়তন যত বাড়বে অর্থের মূল্যও যে তত বাড়বে এ ভুল আমাদের প্রমথবাবু ভেঙ্গেছেন। শব্দকল্পদ্রুমের বাইরেও যে চিন্তাশীলতার অবসর আছে তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।" সংযত তীক্ষ্ণাগ্র মন্তব্য ও পরিহাসপ্রবণতা—যা প্রমথ চৌধুরীর লেখার বৈশিষ্ট্য—তা এখানে বর্তমান।

অপর প্রধান লেখক ধূর্জটিপ্রসাদের রচনায় যুক্তিধর্মিতা ও মননশীলতার পরিচয় পাই। তিনি জীবনে বিজ্ঞানচিন্তার প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: "মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় সামাজিক উন্নতির পথে অন্তরায় রয়েছেন। অথচ শিক্ষা চাই, অবসর চাই, ভদ্রতা চাই। সমস্যা যদি এই হয়, তাহলে কর্তব্য হচ্ছে, সুদূরকে নিকট করে, পৃথককে যোগসূত্রে বেঁধে, বিরোধকে সৃষ্টির কাজে এনে নতুন সমাজ গড়ে তোলা। একটি উপায় শিক্ষা, তবে সে শিক্ষার মানে সাহিত্যের অনার্স নয়। সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচারে এবং শিক্ষিতের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রসারের দ্বারা বিরোধের আংশিক অবসান হবে আশা করি। কারণ সৃষ্টির প্রধান কথা জ্ঞান, ভাবের আবেগ নয়; এবং সে জ্ঞান যত ইহজগতের হয় ততই ইহজগতের মঙ্গল। বিজ্ঞানই ইহজগতের জ্ঞানের মধ্যে একমাত্র পদ্ধতি যাকে বিশ্বাস ও নির্ভর করা যায়; বিস্তর দোষ থাকা সত্ত্বেও এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই সাহায্যে কুসংস্কার ও স্বার্থপরতা দূর হয়, অন্যায়ের বোঝা কমে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় ও বহুদূর পর্যন্ত চলে।" ('আমরা ও তাহারা', মুখবন্ধ, ১ম সং, ১৯৩১)।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যার চর্চা সবুজপত্র মজলিশে হত। উপরিধৃত মনোভঙ্গী তারই ফল। চিন্তার শৈথিল্য, ভাষার জড়তা, প্রকাশভঙ্গীর অসারল্য

ও অস্পষ্টতা, ভাবাবেগের' অতিরেক, বুদ্ধির উপরে বোধির আধিপত্য—, প্রমথ চৌধুরী গ্রাহ্য করেন নি এবং এদের বিরুদ্ধেই তাঁর বিদ্রোহ। সবুজপত্র সেই বিদ্রোহের পরিচয়স্থল। বুদ্ধির মুক্তি ও বিশ্ববিদ্যার নির্মোহ চর্চা করে তিনি বাঙালীকে বিশ্বনাগরিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। সবুজপত্রীরা সে সাধনার সাক্ষ্য। Reason ও Scepticism, যুক্তি ও সন্দেহপ্রবণ বিচারমুখিতা প্রমথ চৌধুরীর আয়ুধ এবং এই সংগ্রামে স্বচ্ছ প্রসাদগুণসমন্বিত কথ্য গদ্যরীতি তাঁর বাহন। ইহজীবন সম্পর্কে সদাজাগ্রত কৌতূহল ও অতন্দ্র বিচারবুদ্ধি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বিশ শতকের গোড়া থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চল্লিশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গিয়েছেন। তার মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত পঁচিশ বছরের পর্বটিকে (১৯১৪-১৯৩৯) 'সমৃদ্ধি-পর্ব' বলে নির্দেশ করা যায়। 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'বসুমতী' ও 'প্রবাসী': এই সাতটি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বেশির ভাগ লেখাই সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়।

॥ ৪ ॥

১৯১৪-১৯৩৯: এই পঁচিশ বছরের যে পর্ব, সে সময়ে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধির মুক্তি ও যুক্তির আশ্রয়ের জন্য অভিযান চালিয়েছেন। বিচার্য এই: প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব সমকালে ও উত্তরকালে সবুজপত্র-গোষ্ঠীর বাইরে কতদূর ও কতটা বিস্তৃত হয়েছিল? রবীন্দ্র-যুগের মধ্যপর্বে সাহিত্যে বিদ্রোহের ঝোড়ো হাওয়া নিয়ে এলেন প্রমথ চৌধুরী। সাহিত্যে কথ্যভাষার ব্যবহার ও দুরূহ চিন্তার বিষয়কে সহজ সরল করে উপস্থিত করার প্রয়াস তিনি করলেন। বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতা, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার চর্চা, যুক্তিধর্মিতা সবুজপত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রভাব বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী ও দূরপ্রসারী হল না। যা ছিল বিদগ্ধ মানসের প্রকাশ, তা হয়ে দাঁড়াল আভিজাত্যগর্বী সংকীর্ণ আত্মম্ভরিতা। যার সূচনা হল ভাবালুতা ও জোলো রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে, তার পরিণতি হল দলগত স্ববারিতে। কেন এমন হল?

১৯১৪—১৯৩৯ঃ এই পঁচিশ বছরের পর্বে যে ক'টি সাহিত্যপত্রকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিকগোষ্ঠী বর্তমান ছিল, তাদের পরিচয় উদ্‌ঘাটনেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে 'সবুজপত্র' (১৯১৪) ছাড়া অন্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যপত্র ছিল এইগুলিঃ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' (১৮৯০), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' (১৯০১), ফণীন্দ্রনাথ পালের 'যমুনা' (১৯০৯), জলধর সেনের 'ভারতবর্ষ' (১৯১৩)। এর পর এই পর্বের প্রসিদ্ধ সাহিত্যপত্র হিসাবে নাম করা যায় এগুলির —মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভারতী' (১৯১৫), চিত্তরঞ্জন দাসের 'নারায়ণ' (১৯১৫), জগদিন্দ্রনাথ রায়ের 'মানসী ও মর্মবাণী' (১৯১৬), বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গবাণী' (১৯২১), হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মাসিক 'বসুমতী' (১৯২২), নজরুল ইসলামের পাক্ষিক 'ধূমকেতু' (১৯২২), দীনেশরঞ্জন দাসের 'কল্লোল' (১৯২৩), প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কালিকলম' (১৯২৬), উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা' (১৯২৭), সজনীকান্ত দাসের মাসিক 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৭) এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' (১৯৩১)। এই ক'টি সাহিত্যপত্রিকাকে কেন্দ্র করে গুটি দশেক সাহিত্য-গোষ্ঠী এই পর্বের কলকাতায় দেখা যায়। সবুজপত্র-গোষ্ঠী নিঃসন্দেহে এদের অন্যতম, কিন্তু প্রধানতম নন।

এখানে তিন শ্রেণীর সাহিত্যপত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে রক্ষণশীল রবীন্দ্রবিরোধী সাহিত্যপত্রঃ সাহিত্য, ভারতবর্ষ, নারায়ণ, বঙ্গবাণী, বসুমতী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে রবীন্দ্রগুণমুগ্ধ সাহিত্যপত্রঃ ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী, প্রবাসী, বিচিত্রা। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে সাহিত্যে আধুনিকতার পতাকাবাহী প্রগতিশীল সাহিত্যপত্রঃ ধূমকেতু, কল্লোল, কালিকলম, শনিবারের চিঠি, পরিচয়। শেষোক্ত শ্রেণীর পত্রগুলির রবীন্দ্রবিরোধিতা রবীন্দ্র-স্বীকৃতির নামান্তর এবং এদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতাও প্রবল।

প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্র-গুণগ্রাহী, কিন্তু অন্ধ রবীন্দ্র-স্তাবক নন। সবুজপত্র সম্বন্ধে একই মন্তব্য করা চলে। সেইজন্য রবীন্দ্রবিরোধী ও রবীন্দ্রভক্ত, কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গেই সবুজপত্রের চিন্তাক্ষেত্রে ঐক্য ঘটে নি, বরং বিপরীতটাই ঘটেছে। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রবিরোধী সাহিত্যপত্র ও

সাহিত্যিকদের আক্রমণ থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে রক্ষার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রানুসারিতাও তাঁর কাম্য ছিল না। অপরপক্ষে, কল্লোল-কালিকলম-এর জীবন-দর্শন তিনি গ্রহণ করেন নি। শনিবারের চিঠি যেমন কল্লোল-কালিকলম-এর অতি-তারুণ্যকে তীব্র উপহাস করেছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর বৈদগ্ধ্যকেও আক্রমণ করেছে।

প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে না পড়ার জন্য দুজন দায়ী হতে পারেন—কবিতাক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কথারাজ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহগামীরা কবিতারাজ্যে যে পরিবেশ গড়ে তুললেন, তা একান্তভাবে রবীন্দ্রানুসারী। রবীন্দ্রকাব্যাদর্শ তাঁরা মনে-প্রাণে গ্রহণ করলেন ও রোমান্টিক কাব্যসাধনাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য বলে পরিগণিত হল। ফলে 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) বা 'পদচারণ' (১৯১৯) কাব্যগ্রন্থ দুটির যুক্তিভিত্তিক বুদ্ধিগ্রাহ্য কাব্যাবেদন বাঙালি পাঠকের কাছে ব্যর্থ হল। কল্লোল-কালিকলম-এর আধুনিক কাব্যসাধনার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ রবীন্দ্রানুসারী কবিদের পল্লীকেন্দ্রিক ঐতিহ্যপ্রেমী ভগবৎবিশ্বাসী রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসী জীবনদর্শনের প্রাধান্য ছিল। তারপর কল্লোল-কালিকলম-এ (১৯২৩-২৬) রবীন্দ্র-কাব্যদর্শনের বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা গেল। বিশ্বাস, আস্তিকতা, রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যানের পরিবর্তে এল সন্দেহ, সংশয়, নৈরাশ্য, নাস্তিকতা ও বাস্তবমুখিতা। নজরুল-মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য প্রমুখের কাব্যসাধনায় পেলাম দেহাতীত কল্পকামনার পরিবর্তে বাস্তবের ক্ষুধাতৃষ্ণার বন্দনা, পেলাম সচেতন দুঃখবাদ, আত্মদ্রোহিতা, রোমান্স-বিরোধিতা, পেলাম সচেতন রাজনৈতিক চেতনা, পেলাম গণমানসের বিক্ষোভের কাব্যরূপ। ঐতিহ্যানুস্মৃতির স্থানে এল যুগচেতনা, শান্তির পরিবর্তে সংশয়, রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যানের পরিবর্তে রূঢ় নিষ্ঠুর বাস্তবের রূপায়ণ। কিন্তু কবি প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত আবেগরহিত মননকে এঁরা কাব্যের উপজীব্য বলে মেনে নিলেন না।

কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব যুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনা। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপূর্ণ তির্যক জীবন-সমালোচনা—যা 'চার ইয়ারি কথা'য় (১৯১৬) দেখা গেল তা কল্লোল-কালিকলম-গোষ্ঠীর লেখকদের বা শরৎচন্দ্রকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করে নি। শরৎচন্দ্রের মূলধন হৃদয়াবেগ,

কল্লোল-কালিকলম-গোষ্ঠীর মূলধন রবীন্দ্রনাথের কথায় 'দারিদ্র্যের আস্ফালন ও লালসার অসংযম'। প্রমথ চৌধুরী যেখানে শ, রাসেল, বের্গসঁর ভক্ত, সেখানে এঁরা স্কাণ্ডিনেভীয় কথাকার ও ইংরেজী গল্পকারদের অনুসারী। এঁদের আরাধ্য রোলাঁ, হামসুন, জোহান বোয়ার, হাক্সলি, লরেন্স। আসলে সবুজপত্রের সাধনা বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতার সাধনা, কল্লোল-কালিকলমের সাধনা আবেগপ্রধান অতিতরল তারুণ্যের সাধনা। সবুজপত্রের মূল ফসল প্রবন্ধের ফসল, কল্লোল-কালিকলমের মূল ফসল গল্প-উপন্যাস-কবিতা। বরং কল্লোলপন্থীরা শরৎচন্দ্রের নিকটবর্তী, প্রমথ চৌধুরী থেকে অনেক দূরে তাঁদের অবস্থিতি। প্রমথ চৌধুরী হতে চেয়েছিলেন র‍্যাশনালিস্ট, কল্লোলপন্থীরা হয়েছিলেন ইমোশনালিস্ট। তাই এই দুইয়ের মিলন তৃতীয় দশকে ঘটেনি, ঘটার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ফলে প্রমথ চৌধুরীর যুক্তি, বুদ্ধি ও মননচর্চা একটি সীমাবদ্ধ অভিজাত সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রইল, তা বহুপ্রসারী হতে পেল না। প্রমথ চৌধুরী কবিতা-গল্পে বাঙালিকে ভাবালুতা ও আবেগ-প্রাধান্য থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ এবং ভারতী-মানসী ও মর্মবাণী-কল্লোল-কালিকলম-গোষ্ঠী তাঁর সে সাধনাকে ব্যাহত করে দিলেন।

তবে কি প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব এই পর্বে কারুর উপরেই পড়ে নি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, সে প্রভাবের একমাত্র শুভকর পবিচয় পাই ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় (১৯৩১)। 'পরিচয়'-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে লেখকগোষ্ঠী গড়ে তুললেন, তাঁদের উপদেষ্টা ছিলেন প্রমথ-শিষ্য ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সেই সূত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। 'পরিচয়ে'র প্রথম যুগের কবিতা ও প্রবন্ধে (এ দুটি প্রধান ফসল) সবুজপত্রের আদর্শের অনুসরণ ও সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। পরিচয়পন্থীরা আবেগমুক্ত যুক্তিভিত্তিক নির্মোহ নির্বিশেষ সংস্কৃতি-সাহিত্য-সাধনায় বিশ্বাস করতেন। মননশীল প্রবন্ধ রচনায় পরিচয়-গোষ্ঠীর লেখকদের কৃতিত্ব প্রমথ-প্রভাবেরই পরিচয়স্থল। এই সময়ের নবসাহিত্যপত্র 'বিচিত্রায়' (১৯২৭) আরেকজন মননশীল লেখকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, তিনি অন্নদাশংকর রায়। সবুজপত্র-গোষ্ঠীর বাইরে সুধীন্দ্রনাথ ও অন্নদাশংকর—কেবল এরা দু জন প্রমথ চৌধুরীর যোগ্য শিষ্য।

॥ ৫ ॥

উত্তরকালের উপর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব বহুবিস্তারী ও দূরপ্রসারী নয়, তা আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করে নিতে হয়। তবে বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতা ও বিশ্বনাগরিকতায় তিনি বাঙালি পাঠককে দীক্ষা দিয়েছেন, তা অবশ্যস্বীকার্য। কথ্যরীতিতে মননশীল আলোচনার প্রবর্তক-রূপে তাঁর নাম অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে কীর্তিত হবে। কোনো দেশের মন সমৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করতে পাবে না যদি তা — reason ও rationalism-এর চর্চা না করে, এ শিক্ষা তিনিই আমাদের দিয়েছেন।

তাঁর কোন্ শিক্ষা আজ আমরা গ্রহণ করব? এর জবাব তাঁর ভাষাতেই দিই। নিম্নধৃত উদ্‌ধৃতিটিতেও তিনি আমাদের—বাঙালি লেখক ও পাঠককুলকে—যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন, তা যদি পালন করি, তবে বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বরাজ্য আমরা লাভ করতে পারব, এ বিশ্বাসে এই আলোচনার সমাপ্তি। তিনি বাংলা দেশের সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আলোচনা করতে গিয়ে এই ধ্রুব সত্য উচ্চারণ করেছেন, "বঙ্গসাহিত্য যতদিন কেবলমাত্র গল্প ও গানের গণ্ডির ভিতর আটক থাকবে, ততদিন শিক্ষিত সমাজে বঙ্গভাষা যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। কেননা শ্রেষ্ঠ কাব্য সাহিত্যের মুকুটমণি হলেও সস্তা কথা ও গাথা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। নিকৃষ্ট কাব্য-সাহিত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে কোনো সাহিত্যেরই গৌরব বৃদ্ধি হয় না, এবং অক্ষম হস্তের অযত্নপ্রসূত গান ও গল্প প্রায়ই উৎকৃষ্ট হয় না; কেননা যথার্থ কাব্যসৃষ্টির জন্য চাই স্রষ্টার প্রাক্তন সংস্কার এবং অসামান্য প্রতিভা। এবং সকলেই অবগত আছেন যে, প্রতিভাশালী লেখক এবেলা ওবেলা হাটে বাজারে মেলে না। হালে বঙ্গসাহিত্যের একটি নূতন চাল দেখে আমি ঈষৎ ভীত হয়ে পড়েছি। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে রসমাহাত্ম্যকীর্তন ও রসতত্ত্ববিচারের বেজায় ধুম পড়ে গিয়েছে। এতে অবশ্য ভয়ের কারণ থাকত না, যদি না সাহিত্যে রসের লোভে তার সারের দিকটা উপেক্ষা করবার সম্ভাবনা এসে পড়ত। কদলীবৃক্ষের

অন্তরে সার নেই, আছে কেবল রস; সে কারণ আমরা যদি বঙ্গসাহিত্যে সেই নিটোল সুগোল মসৃণ চিক্কণ নধর সরস বৃক্ষের চাষের প্রশ্রয় দিই, তাহলে বঙ্গসরস্বতীর কপালে নিশ্চয়ই শুধু কদলীভক্ষণই লেখা আছে। এস্থলে আমি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ভাষার উৎপত্তি কর্মে, আর তার পরিণতি জ্ঞানে। ভাষা ব্যতীত চিন্তা প্রকাশ করবার অপর কোনো উপায় নেই। অপর পক্ষে আমরা যাকে বলি রস, আর ইংরেজরা ইমোশন—সে বস্তু প্রকাশ করবার নানা উপায় আছে, যথা, স্বেদ কম্প মূর্ছা বেপথু শীৎকার চিৎকার প্রভৃতি। সুতরাং একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, জ্ঞান ও চিন্তার বাহন হয়েই ভাষা তার স্বরূপ ও স্বরাজ্য লাভ করে।……বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থা আমাদের কাছে মোটেই সন্তোষজনক নয়। বঙ্গসরস্বতী কালে যে আমাদের মনোজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হবেন, এই দুরাশাই আমাদের উচ্চ আশা।” (‘বাংলার ভবিষ্যৎ’, সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২৪)।

চল্লিশ বছর পরে প্রমথ চৌধুরীর এই উপদেশ ও আশার প্রয়োজন আজো ফুরোয় নি।